KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. KLMLGK 2007	Place of Publication ২৫/2 মোহনবাগান রো, কলিকাতা
Collection KLMLGK	Publisher যোগীন্দ্রনাথ দত্ত
Title [illegible]	Size 4.5" x 7" 11.43 x 17.78 c.m.
Vol. & Number: ১৭/১ ১৭/৪ ১৭/৫	Year of Publication: কার্তিক, ১৩৫৩ মাঘ, ১৩৫৩ ফাল্গুন, ১৩৫৩
	Condition: Brittle / Good
Editor: [illegible] দত্ত	Remarks:

CD Roll No. KLMLGK

শনিবারের চিঠি

ফাল্গুন ১৩৫৩ : মূল্য ছয় আ
FEBRUARY : Price 6 A

সম্পাদক :
শ্রীসজনীকান্ত দাস

স্নানযাত্রা

কি ধর্মানুষ্ঠান, কি সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও আনন্দোৎসব—স্নান আমাদের সমাজ-জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই একটি অঙ্গবিশেষ। কাজেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবনযাত্রাকে বিরাট একটি স্নানযাত্রার সঙ্গে তুলনা করলে অত্যুক্তি করা হবে না। দৈনন্দিন জীবনেও স্নানের আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে 'রেণু' সাবান মেখে স্নান করে দেখবেন। 'রেণু'-র সুগন্ধি ফেনরাশি শরীর স্নিগ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করে স্নানের প্রকৃত প্রশান্তি ফুটিয়ে তোলে মনে। এত গুণের তুলনায় দামেও 'রেণু' সুলভ।

সোল সেলিং এজেন্টস্ :

সূচী

ফাল্গুন ১৩৬৩

সাহিত্যে স্থায়ী ও অস্থায়ী —শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত ... ৩২৫
পুরাতনের যৎকিঞ্চিৎ ... ৩৩৭
অগ্নি—"বনফুল" ... ৩৪১
মহাস্থবির জাতক—"মহাস্থবির" ... ৩৫৬
সম্পাদকীয় ... ৩৬৭
বিরূপাক্ষের চিঠি—শ্রীবিরূপাক্ষ ... ৩৬৮
নবপরিচয়—শ্রীঅমলা দেবী ... ৩৭১
পদচিহ্ন—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৮৭
সংবাদ-সাহিত্য ... ৪০২

'শনিবারের চিঠি'র অগ্রিম চাঁদার হার

বার্ষিক ৪৸৹ ও ষাণ্মাসিক ২।৵৹ ; প্রথম সংখ্যা ভি.পি.তে পাঠাইয়া চাঁদা আদায় করিতে হইলে—যথাক্রমে ৪৸৶৹ ও ২।৶৹ ; প্রতি সংখ্যা রেজিস্টার্ড বুক-পোস্টে পাঠাইতে হইলে—যথাক্রমে ৭৲ ও ৩॥৹। প্রতি সংখ্যা ডাকে ।৵১০ ; ভি. পি.তে ॥৵৹। বর্ষ আরম্ভ কার্তিক হইতে ; গ্রাহক যে কোন মাসে হওয়া যায়।

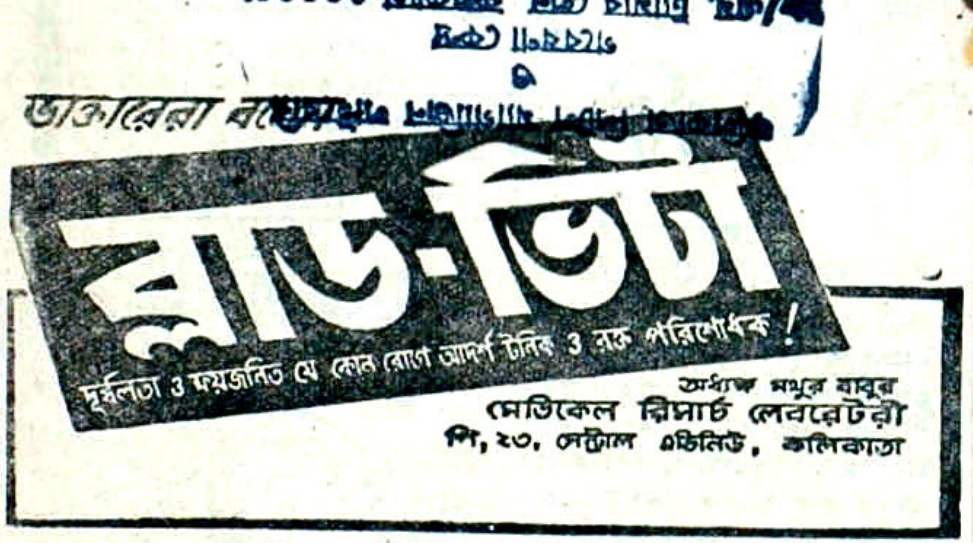

ডাক্তারেরা ব
ব্লাড-ভিটা
দুর্বলতা ও ক্ষয়জনিত যে কোন রোগে আদর্শ টনিক ও রক্ত পরিশোধক !
অধ্যক্ষ মথুর বাবুর
মেডিকেল রিসার্চ লেবরেটরী
পি, ২৩, সেন্ট্রাল এভিনিউ, কলিকাতা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বাংলা দেশের মেয়েদের দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও বিস্তৃত কেশরাশ অন্যান্য প্রদেশের স্বল্পকেশী ভগ্নীদের প্রশংসার বস্তু। স্বভাবতই বাঙ্গালী মেয়েদের কেশবিন্যাসে বিভিন্ন মৌলিক পদ্ধতি দেখা যায়।

কেশের এই সৌন্দর্য্য বজায় রাখতে কেশতৈল বাঙ্গালী মহিলাদের পক্ষে একটী অপরিহার্য্য প্রসাধন সামগ্রী। কেশের বৃদ্ধি ও সজীবতা যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়, রূপচর্চ্চায় কেশের স্থানই যদি সর্ব্বোচ্চ হয়, তা হলে কেশমূল যাতে সতেজ থাকে, তার জন্য বিশিষ্ট কেশতৈল দ্বারা তা নিয়মিত ঘর্ষণ করতে হবে। বাথগেটের পরিস্কৃত ও স্নিগ্ধ গন্ধযুক্ত ক্যাষ্টর অয়েল একশো পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে কেশচর্চ্চায় সুনাম অর্জ্জন করে আসছে। আপনার নিকট এর দাবী সেই সুনামের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

বাথগেটের সুবাসিত ক্যাষ্টর অয়েল

Bathgate & Co. Ltd.
CALCUTTA BOMBAY LONDON

টেলিফোন : ক্যাল ১৪৫৩ টেলিগ্রাম : বিল্ডট্রাস্

বিল্ডিং এণ্ড ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট (ইণ্ডিয়া)
লিমিটেড
৩নং ম্যাঙ্গো লেন : কলিকাতা।
ব্রাঞ্চ : কদমকুয়া (পাটনা) ৯২, লাটুস্ রোড, লক্ষ্ণৌ।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় আমাদের অংশীদারগণকে সহজকিস্তিতে গৃহনির্মাণের সুযোগ ও ৫০০ শত টাকার বিনিময়ে পুরুষানুক্রমে ৫ বিঘার জমির ধান্যের অর্দ্ধাংশ দিয়া থাকি। বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর স্থানে কলোনী স্থাপন করিয়া পুনর্বসতির সহায়তা করিতেছি। ১৯৪৫ সালে ৬% আয়করমুক্ত লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন।

নবেন্দু ঘোষের—
সদ্যপ্রকাশিত
প্রান্তরের গান
প্রাক্‌যুদ্ধ যুগ থেকে আগষ্ট আন্দোলন পর্য্যন্ত যুগান্তকারী আলোড়নের পটভূমিকায় বাঙ্গলার গ্রাম্যজীবনের সুখদুঃখ নিয়ে সম্পূর্ণ বাস্তব-দৃষ্টিতে লেখা সুবৃহৎ উপন্যাস।
দাম—৪৲

তারাপদ রাহার
সদ্যপ্রকাশিত ছোট গল্প-সংগ্রহ
শুভার কবিতা
বাংলা সমাজের নানা ছোটখাট সমস্যা আর সহজ সুন্দর কতগুলি চরিত্রকে নিয়ে নয়টি গল্প।
দাম ২৲

অনুবাদ গ্রন্থ :
ভান্দি ভাসিলিয়েভস্কার
ভালবাসা (Just Love) ২৷৷০
ষ্টাইনবেকের
অস্তগামী চাঁদ
(THE MOON IS DOWN) ২৷০

ছোটদের বই
স্মোকি ১৷৷০
(একটি বুনো ঘোড়ার কাহিনী)
শতাব্দীর লেখা
কিশোরদের প্রিয় সংকলন। দাম—৩৷৷০

মডার্ণ পাবলিশার্স ৪ ৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

শনিবারের চিঠি
১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৩

সাহিত্যে স্থায়ী ও সঞ্চারী

১

সাহিত্যে যাহা স্থায়ী ও সঞ্চারী, জগতে ও জীবনে তাহাকে এক হিসাবে বলা যায়—শাশ্বত ও চলমান, অথবা স্থিতি ও গতি। শব্দ দুইটির সম্পর্ক হয়তো খানিকটা আপেক্ষিক, অর্থও হয়তো মানুষের যুগানুগ ধারণা-অনুযায়ী কতকটা সীমাবদ্ধ। কিন্তু ইহা বলিলেই উহাদের তাৎপর্য পরিস্ফুট হয় না; কিঞ্চিৎ বিশদ বিশ্লেষণের আবশ্যকতা থাকে।

স্থায়ী কি? অস্থায়ী কি? সঞ্চারী কি? অস্থায়ী ও সঞ্চারী না হইলে স্থায়ীর অভিব্যক্তি ও আস্বাদন সম্ভবপর কি? চলমানের পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন শাশ্বতের প্রকাশ ও উপলব্ধি হইতে পারে কি? গতি না থাকিলে স্থিতি-তত্ত্বের অর্থ হয় কি প্রকারে? অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যু অতিক্রম করিতে না পারিলে বিদ্যা দ্বারা অমৃত-লাভ ঘটে কি? ভাবের ন্যায় রসেরও স্থায়ী ও সঞ্চারী রূপ আছে কি? স্থায়ী ভাব হইতে রসোৎপত্তির ন্যায় সঞ্চারী অথবা ব্যভিচারী ভাব বলিয়া যাহা পরিচিত, তাহা হইতেও অবস্থাবিশেষে রসোৎপত্তি হইতে পারে কি? সঞ্চারী না থাকিলেও অবস্থাবিশেষে কেবল স্থায়ী ভাব হইতে রসাস্বাদন হয় কি? স্থায়ী ও সঞ্চারী ভেদ ভাবের ন্যায় দীপ্তিগুণজাত রম্যার্থেও লক্ষ্য করা যায় কি? সাহিত্যে স্থায়ী ও সঞ্চারী সম্পর্কে এইরূপ অনেক প্রশ্নই উঠিতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে বিষয়গুলি আলোচনার ভূমিকা রচনা করা হইতেছে মাত্র।

পাশ্চাত্ত্য দেশে সাহিত্যকে বলা হইয়া থাকে, "the core and spirit of both history and philosophy"—ইতিহাস ও দর্শন উভয়েরই মর্মবস্তু এবং আত্মা। আধুনিক কবি ডি. এস. স্যাভেজ বলেন, "The mind and spirit of an age survive mainly in its literary expression, through books"—যুগের মন ও আত্মা তাহার পুস্তকগত সাহিত্যিক অভিব্যক্তির মধ্য দিয়াই প্রধানত বাঁচিয়া থাকে। তাহা হইলে মানব-সংস্কৃতির মুখ্য প্রকাশ তাহার সাহিত্যে। এই সাহিত্য শব্দার্থের আশ্রয়ে পুস্তকে লিপিবদ্ধ থাকে।

আমাদের প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থ রামায়ণে ঘোষণা করা হইয়াছে—

"যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।"

—যতকাল পৃথিবীতে পর্বতমালা ও নদনদী বর্তমান থাকিবে, ততকাল লোক-সমাজে রামায়ণ-কথাও প্রচারিত থাকিবে।

মহান্ এবং ভাববান্ মহাভারতের মহাকবি ওই বিপুল কাব্যগ্রন্থকে তুলনা করিয়াছেন ভারতবর্ষের মহাসমুদ্র ও হিমালয়-পর্বতের সঙ্গে,—

"যথা সমুদ্রো ভগবান্ যথা বা হিমবান্ গিরিঃ।"

রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন, "রামায়ণ-মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।" এই কাব্য-যুগলের কি সে মহিমা, যাহার বলে হিমালয়ের ন্যায় তাহারা শাশ্বত রূপ-বিশালতা লাভ করিয়াছে, জাহ্নবীর ন্যায় নিত্যকাল অক্ষয় রসধারা প্রবাহিত করিতেছে! এই কাব্য-যুগলের স্থায়িত্বের কারণ কোথায়? সেই যুগ আর এই যুগের মানব-সাধারণের চিত্ত-ভূমিকে সমান বলে আলোড়িত করিতেছে, সে কি শক্তি? দীর্ণ ভূমির অন্তর হইতে একই আনন্দ-নির্ঝর উচ্ছ্বসিত করিতেছে, সে কোন্ সত্য? সে যুগ ও এ যুগের কবি ও সমাজ-চিত্তে তুল্যরূপী সহজ ধর্ম বলিয়া কিছু আছে কি? মহাসমুদ্রের অবিরাম স্পন্দনের ন্যায় মহামানবের হৃৎস্পন্দন বলিয়া কিছু আছে কি? মহামানবের মহাপ্রাণের বিরাট স্পন্দন দূর—অতিদূর যুগে যেমন, আজও কি তেমন করিয়া স্পন্দিত হইতেছে? শুনিতে পান যিনি, তাঁহার হৃদয়ে সে স্পন্দনের প্রতিস্পন্দন জাগে? ধরিত্রীর বুকে ফোটে ফুল, বয় ঝরনা, শ্যামল শস্যাঞ্চল অঙ্গে থাকে লীন, ছয় ঋতুর নব নব সঞ্চারে অন্তরে জাগে নব নব পুলক-সম্ভার। সে যুগেও যেমন, এ যুগেও তেমন। ধরণীর গূঢ় গভীর ভূয়িষ্ঠ প্রাণশক্তির ন্যায় বিশ্বমানবের হৃদয়াভ্যন্তরে মানবের নিত্য স্ব-ধর্মরূপে এমন কি শক্তি রহিয়াছে, যাহাতে যুগে যুগে কাব্যে কথায় শিল্পে কলায় তাহাকে আমরা সহজেই আপনার বলিয়া চিনিতে পারি? বহু বহু শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগের কবি আধুনিক পাঠককে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনাইয়া সেই শাশ্বত রাগিণীরই ইঙ্গিত করিতেছেন। দ্বিধা-ভিন্ন ধরণীর অন্তরে অদর্শন হইলেন জানকী। তারপর—

"সে সকল দিন সেও চ'লে যায়,
সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়,
যায় নি ত এঁকে ধরণীর গায়
অসীম দগ্ধ রেখা।
দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার,
দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার,
সরযূর কূলে দুলে তৃণসার
প্রফুল্ল শ্যাম-লেখা।
শুধু সেদিনের একখানি সুর
চিরদিন ধ'রে বহু বহু দূর
কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর
মধুর করুণ তানে,
সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে
যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে
আজিও সে গীত মহাসঙ্গীতে
বাজে মানবের কানে।"

আবার দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পর মহাভারতের মহাঘটনার অবসান হইয়া গেল। কালক্রমে—

"কুরুপাণ্ডব মুছে গেছে সব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব
ভস্মও নাহি তার,
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি,
কোথা ছিল রাজা কোথা রাজধানী
চিহ্ন নাহিক আর।
তবু কোথা হতে আসিছে সে সুর—
যেন সে অমর সমরসাগর

গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে ;
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
সফল আশার বিষাদ মহান্,
উদাস শান্তি করিতেছে দান
চিরমানবের প্রাণে ॥"

স্থরি ভবভূতি তো তাঁহার কাব্য-সম্বন্ধে আপন যুগের নিষ্ঠুর বিমুখতা দেখিয়া তাকাইয়াছিলেন কেবল বিপুলা পৃথ্বী নয়, নিরবধিকাল, দূর ভবিষ্যতের দিকে।

প্রশ্ন হইতে পারে,—ভারতবর্ষে একই ধর্ম, একই সমাজবোধ ও সংস্কৃতির বহমান ধারায় অতীত যুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে এক নিবিড় বন্ধন রহিয়াছে। এই সকল অবস্থার পরিবর্তনে আমরা প্রাচীন সাহিত্যের রস আস্বাদন করিতে পারিব না। মহাকবি গেটে মহাকবি কালিদাস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন যুগে ভিন্ন দেশে ভিন্ন ধর্ম ও সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া ভিন্ন শিক্ষা ও সভ্যতায় পুষ্ট হইয়া শকুন্তলা নাটকের রস অমন করিয়া গ্রহণ করিলেন কি করিয়া? কেবল কবিগত সাধর্ম্যের কথা বলিলেই ইহার উত্তর হয় না। তাহার চাইতেও গভীরে মানব-প্রকৃতির সহজ ও শাশ্বত ধর্মের কথা—মানবচিত্তের স্থায়ী ভাব ও বোধের কথা বলিতে হয়।

পাশ্চাত্ত্য দেশে বলা হয়—Eternity is Homer—চিরন্তন হোমর। কোনও গ্রন্থকার বাঁচেন পাঁচ বা দশ বৎসর, কেহ বা পঁচিশ বৎসর ; শতায়ুঃ যিনি, তিনি ভাগ্যবান্ ; কেবল হোমরই চিরন্তন। হোমরের যুগের সে পেগান ধর্ম নাই, সে যুগের দেবদেবী আজ পুরাতত্ত্বের বিষয় হইয়া গিয়াছে। সে সমাজ-সংস্থিতিও নাই। কিন্তু কই ইলিয়ড কাব্যের আদর তো একটু হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই! একিলিসের ক্রোধভাব আজিও ইউরোপের খ্রীষ্টধর্মী পাঠকবর্গের চিত্তে সমানভাবেই আলোড়ন তুলিয়া থাকে। ফেরদৌসির শাহনামা প্রাক্-মুসলমান যুগের কাহিনী। সে যুগের ধর্ম-বিশ্বাস সর্বপ্রকারেই ইসলামের ধর্মবোধকে আঘাত করে। কিন্তু আশ্চর্য! মহাকবি ফেরদৌসির জন্মভূমি কেবল পারস্য দেশের নয়, হিন্দুস্থানের মুসলমানগণও সে কাব্য-পাঠে উল্লসিত হয়, গৌরব বোধ করে। কাজেই বুঝিতে হইবে, পৃথিবীর স্থায়ী কাব্য

মানবের এমন সাধারণ সহজ চিত্তভাব লইয়া রচিত হয়, যাহা মানবের সৃষ্ট ধর্ম ও সমাজ-রূপের উর্ধ্বে। এই ভাব বা বোধগুলি মানবের চিত্তে গূঢ়রূপে নিত্য বহমান, তাহারাই মানবের আসল মানবত্ব, মানবের সহজ ধর্ম বা স্বভাব, তাহারাই স্থায়ী ভাব। স্থায়ী ভাব অবলম্বনে রচিত প্রকৃত সাহিত্যই স্থায়ী সাহিত্য।

দান্তে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে কবি শেলি মন্তব্য করিয়াছেন—"A great poem is a fountain forever overflowing with the waters of wisdom and delight ; and after one person and age has exhausted all its divine influence which their peculiar relations enable them to share, another and yet another succeeds, and new relations are ever developed, the source of an unforeseen and unconceived delight."—মহৎ কাব্য যেন এক প্রস্রবণ, নিত্যকাল তাহা হইতে প্রজ্ঞা ও আনন্দের সলিল উচ্ছ্বসিত হইতেছে ; এবং এক ব্যক্তি ও এক যুগ তাহার বিশিষ্ট সম্বন্ধানুযায়ী ইহার দিব্য প্রভাব নিঃশেষে গ্রহণ করিলেও, আর এক এবং তারপর আর এক যুগ আসে, নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়,—উহা এক অদৃষ্ট-পূর্ব এবং অচিন্তিত-পূর্ব আনন্দের উৎস।

কবি শেলির মন্তব্য যথার্থ, বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। ব্যঞ্জনা-ধর্মেও যেখানে ব্যক্তি ও যুগের নব নব সম্বন্ধানুযায়ী কাব্যের নিবিড় আস্বাদন সম্ভবপর হয়, সেখানে এই অস্থায়ী ব্যক্তি ও যুগের সম্বন্ধের অতীত স্থায়ী বস্তু কিছু রহিয়াছে, তাহার আলম্বনেই কাব্যের এই বিচিত্র লীলা-বিলাস চলিতে থাকে। অভিসারিকা বা অভিমানিনী উভয়েই যেখানে তৃপ্তি পায়, সেখানে উভয়ের আলম্বন-ভূত স্থায়ী প্রেমভাবের কথা বুঝিতে হইবে।

মনস্বী কার্লাইল যেন শেলির উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"The latest generations of men will find new meanings in Shakespeare, new elucidations of their own human being."—মানবের দূরভবিষ্যৎ পুরুষও শেক্স্পীয়রের মধ্যে আবিষ্কার করিবে—নূতন অর্থ, তাহাদের নিজ মনুষ্যসত্তার স্বচ্ছ ব্যাখ্যান।

এখানেও আমরা বিশ্বমানবের মূলীভূত এক মহাভাবের আকর্ষণ উপলব্ধি

করি আগে, এই মহাভাবই সৃষ্টির স্থায়ী ভাব, তাহারই অবলম্বনে ব্যঞ্জনা-শক্তির নব নব উল্লাস ঘটিতে থাকে। কবি ডি. এস. স্যাভেজ তাঁহার *The Personal Principle* নামক সুলিখিত গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন, শেক্‌স্‌পীয়রের সময়ে ব্যক্তিই ছিল সমাজের প্রকৃত কেন্দ্র, সভ্যতার অগ্রগতির সহিত কেন্দ্র এখন সরিয়া গিয়াছে, সমাজের বহির্গঠন এখন আর সাক্ষাৎভাবে ব্যক্তি-পুরুষের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যসমূহে আমরা এক 'living soul'-এর গভীর স্পর্শ পাই বলিয়া আজিও সে সকল আদরের সহিত পঠিত ও অভিনীত হইতেছে। এই সমালোচকের মতে খ্রীষ্টীয় চার্চের শাসনবন্ধন শিথিল হইয়াছিল বলিয়াই এই 'living soul' বা জীবন্ত আত্মার প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল। আমরা বলিব, তৎকালীন ধর্ম ও সমাজের এবং আরও নানা প্রকারের আরোপিত প্রভাব অতিক্রম করিয়া সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ চিত্ত লইয়া কবি শেক্‌স্‌পীয়র অন্তরে ও বাহিরে বিশ্বমানবতাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার রচনায় কালজয়ী স্থায়ী লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। মহাকবি কালিদাস সম্পর্কেও ওই একই মন্তব্য করা চলে।

বিষয়টি হৃদ্য করিয়া বুঝাইয়াছেন রবীন্দ্রনাথ "সাহিত্যের বিচারক" প্রবন্ধে। নিত্যকালের সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—"নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ। জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানবমন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিস সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানবমন পুনশ্চ নিজের জিনিস নির্বাচন করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।...সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্তা।...জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে—এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।.. সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্তমানকালের জন্য নহে। চিরকালের মনুষ্যসমাজই তাহাদের লক্ষ্য।... এইজন্য বর্তমানকালকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্য নিবেশ করিতে হয়।"

আমরা বলিতে চাই, যে মানবত্ব অর্থাৎ বিশ্বমানবত্ব সাহিত্যের সৃজনকর্তা, সেই মানবত্বই সাহিত্যের সৃষ্টির বিষয়। নতুবা নানা দেশের নানা কালের

মানবের মনে কবির সৃষ্টি রসের আবেদন আনে কি করিয়া? কবির চিত্তে বহির্জগৎ তাহার বৈচিত্র্য লইয়া প্রবেশ করে। কবিচিত্তের বিশ্বমন বা বিশ্বমানবমন আবার পাকা জহুরীর ন্যায় তাহা হইতে সেই সমস্ত উপাদানই গ্রহণ করে, যাহা নিত্যকালের ভাণ্ডারে অক্ষয়রত্নস্বরূপ। তাহা হইলেই প্রশ্ন আসে, সেই সহজ মানবত্ব বা বিশ্বমানবত্ব কি? কারণ তাহাই সাহিত্যে স্থায়ী। স্থায়ী উপাদানেই স্থায়ী সাহিত্য রচিত হয়। মহাকালের পরিদর্শনশালায় যে যে মূর্তি রূপে রসে অভিন্ন হইয়া মানবমনে মহিমান্বিত হইয়াছে, তাহাদের দিকে চাহিলেই রহস্যের সন্ধান মিলে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের প্রধান কথাই এক অখণ্ডতাবোধ। ব্যক্তি-জীবনের সহিত বিশ্বজীবনের নিবিড় যোগ, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপিয়া মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মানবসত্তা, সমগ্র জীবসত্তা লইয়া এক বিপুল একাত্মবোধ, ইহাই তাঁহার অখণ্ডতাবোধ। প্রতিভাকে তিনি বলিয়াছেন, বিশ্বমানবমন। সেই প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার 'আমি'র পরিচয়ে—

"ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে-বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।"

এই সর্বত্রগামী প্রতিভা বৈদিক ঋষি গৌতমের সত্যনিষ্ঠাকে অনবদ্য আধুনিক রূপ দিয়াছে। যে প্রকৃতি বৈদিক ঋষির শুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রাণলাভ করিয়া বাল্মীকি ও কালিদাসের সাধনায় নব নব ভাবের বিচিত্র স্পন্দনে আভরণের আবরণে মোহিনী রূপসী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে তিনি বিশ্ব জুড়িয়া এক চিদাসন রচনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা শুধু ঐতিহ্য-ধারার কালানুগ পরিপুষ্টি নয়, অসম্পূর্ণের সম্পূর্ণতা নয়, ইহা বীজরূপ এক শাশ্বত স্থায়ী চিত্তভাবের বহুধা বিকাশ।

জননী গান্ধারীর মর্ম-ব্যথা ও ধর্ম-দৃষ্টিকে তিনি নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। দেবযানীর সাহসী প্রেমকে সুন্দর করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। কবি কালিদাসের মদনভস্মের অনুপম বিবরণকে নব নব ভাব-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়া পরম পূর্ণতায় পরিস্ফুট করিয়াছেন। অতীতের স্থায়ী ভাব পুরাতন নহে, নববেশে বর্তমানেও তাহা স্থায়ী ও নবীন। রামেন্দ্রসুন্দর, মহাভারততুল্য

মহাকাব্যের আর উদ্ভব হইবে না—ইহা বুঝাইতে গিয়াও সূক্ষ্মভাবে তলাইয়া দেখিয়া স্বীকার করিয়াছেন, "মনুষ্যচরিত্র অধিক বদলায় নাই।"

স্থায়ী সাহিত্যের ভিত্তিই মানব-সাধারণের অন্তর্গূঢ় ভাবরাশি, তাহারাই সাহিত্যে স্থায়ী ভাব বলিয়া পরিচিত। কড্‌ওয়েল কাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে গিয়া একটি সূক্ষ্ম তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত সংজ্ঞাটি হইতেছে—"Poetry is the nascent self-consciousness of man, not as an individual but as a sharer with others of a whole world of common emotion."—কাব্য মানুষের উদ্ভিদ্যমান আত্মচেতনা, কিন্তু তাহার ব্যক্তিস্বরূপে নয়, অন্য সকলের সহিত সাধারণ ভাবসমূহের অংশীদারস্বরূপে।

কড্‌ওয়েলের অভিমতে কাব্যের অবলম্বন হইতেছে মানব-সাধারণের সহিত তুল্যরূপে অনুভূত ভাবরাশি। সর্বমানব-সাধারণ এই ভাবগুলিকেই বলা হয়—স্থায়ী ভাব। মহৎ কাব্যমাত্রই এক সামাজিক রচনা, সহৃদয় সামাজিকবর্গই তাহা আস্বাদন করিয়া থাকেন। ব্যক্তির বিশিষ্ট বোধকে লইয়া কাব্য এবং উৎকৃষ্ট কাব্যই রচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা সর্ব কালে স্থায়ী সাহিত্য হইবে কি না বলা কঠিন। স্থায়ী সাহিত্য সাধারণত বহুজনের চিত্তাশ্রিত বহুজন-সম্মত সাহিত্য এবং তাহাই কালজয়ী সাহিত্য। এখানেও কঃ পন্থাঃ—প্রশ্ন হইলে উত্তর হইবে, 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। মহাজন শব্দের অর্থ মহান্ জন বা মহাপুরুষ নহে, বহুজন বা অনেক পুরুষ। মহাভারতের টীকাকার পণ্ডিত নীলকণ্ঠ এখানে কালক্রমাগত প্রাচীন ব্যাখ্যা স্মরণ করিয়াই লিখিয়াছেন, "বহুজনসম্মত মেব মার্গমনুসরেৎ।"—বহুজনসম্মত পথই অনুসরণ করিবে। "নৈকো ঋষি র্যস্য মতং ন ভিন্নম্"—একটি ঋষিও নাই যাঁহার মত ভিন্ন নহে, এই উক্তি পূর্বে থাকায় প্রসঙ্গবলেই মহাজন অর্থ মহান্ জন বা ঋষি জন হইতে পারে না। "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"—ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত আছে, অতএব তাহাও দুর্জ্ঞেয়। সুতরাং মহাজন অর্থাৎ বহুজন বা বহুতর জন যে পথে চলেন, তাহাই অনুসরণীয় পন্থা। আমরাও বলিতে চাই, স্থায়ী সাহিত্যের জন্য একটি বিশিষ্ট ভাবুক মনস্বীর অতিবিশিষ্ট ভাবনা অপেক্ষা বহুতর জনের চিত্তাশ্রয়ী স্থায়ী ভাবরাশিই সমধিক গ্রহণীয়।

কৃষ্ণের বাঁশী বাজে। আপন আনন্দে আপন মহিমায় ভরপুর হইয়া

আমাদের গভীর অন্তরে পরমাত্মার বাঁশী বাজে। সেই গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাণ-পুরুষ চিদানন্দমূর্তি, তাঁহার আনন্দবাঁশী নিত্যকাল বাজে। শুনিয়াছে যে সেই মোহন বাঁশী, ছুটিয়াছে সে অন্তরপুরুষের অভিমুখে আত্মহারা হইয়া, আত্মহারা হইয়া পাইয়াছে সে পরমাত্মার পরমানন্দ। ঘুচিয়াছে তাহার পরিচিত পরিমিত ব্যক্তিত্বের বন্ধন, ভাঙিয়াছে তাহার চিদাবরণ, গলিয়া গিয়াছে তাহার চিত্তের মোহচঞ্চল রূপ। সুখদুঃখ-লোভমোহের উর্ধ্বে তাহার শুদ্ধসত্তার আনন্দপ্রদীপের তখন বাধামুক্ত উজ্জ্বল প্রকাশ। এ আনন্দে আর কুলবন্ধন, লাজবন্ধন কোনও বন্ধন নাই, কোনও সংস্কার নাই। ঋষির ভাষায় তাহার "পিতা হ পিতা ভবতি, মাতা হ মাতা, লোকা অলোকা, দেবা অদেবা, বেদা অবেদা।"—পিতা অপিতা হইয়াছেন, মাতা অমাতা, নাই তাহার স্বর্গলোক সুখলোক, নাই দেবতা, বেদরাশিও নাই। সর্বসংস্কারমুক্ত আনন্দঘনমূর্তি সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ; ব্রহ্মানন্দ বা কাব্যানন্দ উভয়ই আত্মানন্দ, মাত্রার ভেদ মাত্র। আমরা সবাই এই আনন্দের উপাসক, আনন্দের ভিখারী। ব্রহ্মের সৃষ্টির ন্যায় কবির সৃষ্টিও এই আনন্দের খেলা, স্বরূপত যেন অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন নিষ্কাম আনন্দের বিলাস।

এই আনন্দই মানুষের সহজানন্দ, আসল স্থায়ী। মানুষ যে মুহূর্তে তাহা পায়, সেই মুহূর্তে থাকে না তাহার জাতি-কুল-মান, ব্যক্তিত্বের বিচিত্রবোধ বিগলিত হইয়া যায়। স্থায়ী সাহিত্যের অন্তর্গত সংস্কারের অতীত চিত্তভাব যখন অপর চিত্তকে তন্ময় করিয়া সংস্কারের উর্ধ্বে উন্নীত করে, তখন সহজ মানুষ বা শাশ্বত মানুষের আত্মপ্রকাশের ফলে জাগে আত্মবোধ বা আত্মানন্দ। কাব্যপাঠে জাত বলিয়া ইহাকেই বলা হয়—কাব্যানন্দ। আমাদের আলঙ্কারিকেরা এই ব্যাপারের নাম দিয়াছেন সাধারণীকরণ। পাশ্চাত্ত্যের মনীষীগণও নানা ভাবে এই ব্যাপারটি বুঝাইয়াছেন। বার্গসোঁ বলিয়াছেন, আর্টের লক্ষ্য হইতেছে "to put to sleep the active powers of our personality,"—আমাদের ব্যক্তিপুরুষের কর্মচঞ্চল শক্তিগুলিকে ঘুম পাড়াইয়া রাখা। তখনই প্রকাশ পায় আত্মানন্দ, প্রাচ্যেরা যাহাকে বলিয়াছেন, 'সদ্যঃপরনির্বৃতি' 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর', পাশ্চাত্ত্যেরা বলিয়াছেন 'supreme happiness', 'joy forever', 'pure and eleveted pleasure'। এই আনন্দে আমাদের শুদ্ধ সত্তা সর্বদা ওতপ্রোত থাকে। যে সাহিত্য আস্বাদনে 'vision' বা 'প্রতিভানে'র ফলে

আমাদের বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় সত্তার নব প্রকাশ ও উদ্বোধন হয়, তাহাই স্থায়ী সাহিত্য। সাহিত্যের যত গুণই থাকুক, মনোলোকের অতীত বোধময় আনন্দ সত্তার গভীর স্পর্শ না পাইলে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। এই স্পর্শই এক আনন্দময় আত্মোপলব্ধি।

পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞানবিৎ সাহিত্যিক পণ্ডিত ওয়েল্‌স্ মানবজাতির বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"When we come to look at them coolly and dispassionately, all the main religious, patriotic, moral and customary systems in which human beings are sheltering to day, appear to be in a state of jostling and mutually destructive movement, like the house and palaces and other buildings of some vast, sprawling city overtaken by a landslide." *The outlook for Homo Sapiens*—শান্ত এবং নিরাসক্ত ভাবে যখন আমরা উহাদের দিকে তাকাই, তখন মনে হয়, আকস্মিক ভূমি-পতনে আক্রান্ত এক বিশৃঙ্খল নগরীর গৃহ, প্রাসাদ এবং ভবনসমূহের ন্যায় মানবজাতির বর্তমান আশ্রয়-স্বরূপ ধর্ম, দেশপ্রীতি, নীতি ও আচার-সম্বন্ধীয় প্রধান ব্যবস্থাগুলি পরস্পরকে আঘাত করিতেছে এবং ধ্বংস করিতেছে।

মনস্বী ওয়েল্‌সের এই দর্শন হয়তো যথার্থ-দর্শন। তথাপি সাহিত্যের স্থায়ী বস্তুর বিচারে আমরা বলিব, 'এহ বাহ্য'। আত্মবিৎ রাজর্ষি জনকের ন্যায়ই আমরা বলিব, 'মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং নমে দহ্যতি কিঞ্চন'—মিথিলা প্রদগ্ধ হইলেও আমার কিছু দগ্ধ হয় না।

কারণ, যাহা দগ্ধ হইতেছে, তাহা স্থায়ী ছিল না, তাহা বাহিরের উপাদান, অস্থায়ী। তাহা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে। যাহা ভাঙিবে, তাহার স্থলে নূতন সৌধ গগনচুম্বী চূড়া লইয়া দেখা দিবে। তাহাও হয়তো একদিন ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে, কিন্তু সেখানেও দেখা দিবে মানবপ্রতিভার নবসৃষ্টির নবমহিমা। মহাকালের মধ্য দিয়া মানবতার জয়-যাত্রা চলিয়াছে। কিন্তু এই ভাঙাগড়ার অন্তরালে মানবের যে আদি প্রেরণা-শক্তি কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাহাকেই সর্বাগ্রে লক্ষ্য করিতে হইবে। মানুষ কেন বলে—'ইহা চাই, ইহা এইরূপ চাই, ইহা চাই না'? মানবের সেই চিত্তাবস্থাই সাহিত্যের স্থায়ী বস্তু।

সেই চিত্তাবস্থা প্রাচীন যুগে যেমন ছিল, বর্তমান যুগেও স্বরূপ লক্ষণে প্রায় তেমনই। সর্বমানব-সাধারণ সেই প্রীতি, ক্রোধ, শোক, ভয়, উৎসাহ, বিস্ময় ভাব অনুকূল প্রতিকূল বহু ব্যাপারে মানুষকে সমানভাবে চালিত করিতেছে। পরিবর্তনশীল ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের মূলে এই ভাবগুলি এবং মানবোচিত অন্য কয়েকটি ভাবই বিদ্যমান। আর বিদ্যমান একটা পূর্ণতা, প্রতিষ্ঠা ও পরিতৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা। জীবনে ও সাহিত্যে ইহাই স্থায়ী।

তাই তো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের আলঙ্কারিকগণ সাহিত্যের ভাব নয়,—উপাদান-বিচারে বস্তু অবস্তু সকলকে সমান ঠাঁই দিয়াছেন। তাহারা উপাদান মাত্র! ধনঞ্জয় বলেন—

"রম্যং জুগুপ্সিতম্ উদারম্ অথাপি নীচম্
উগ্রং প্রসাদি গহনং বিকৃতং চ বস্তু।
যদ্ বাপ্যবস্তু, কবিভাবক-ভাব্যমানং
তন্নাস্তি যন্ন রসভাবম্ উপৈতি লোকে॥"

—রম্য, জুগুপ্সিত, উদার, কিংবা নীচ, উগ্র, চিত্তপ্রসাদকর, গহন, অথবা বিকৃত যে সকল বস্তু, এমন কি অবস্তু—এইরূপ কিছুই নাই, কবির ভাবনা-শক্তি দ্বারা ভাব্যমান হইলে যাহা লোকে রসভাব প্রাপ্ত না হয়।

শেক্‌স্‌পীয়র বলিয়াছেন কবির চক্ষু সৃষ্টির উন্মাদনায় নিরীক্ষণ করে "from heaven to earth, from earth to heaven"—স্বর্গ হইতে ভূতল এবং ভূতল হইতে স্বর্গ। এবারক্রম্বি বলেন, 'the whole conceivable world'—মনুষ্যের বোধ-গম্য সমগ্র জগৎই কবির সৃষ্টির বিষয় হইতে পারে।

এই উপাদান অস্থায়ী, কিন্তু তুচ্ছ নয়; ইহারাই জগৎ ও জীবন। ইহাদের অবলম্বনেই স্থায়ী ভাব ও স্থায়ী সাহিত্যের প্রকাশ। আমরা স্থায়ীর বিচারে মূলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছি বলিয়া আপাতত ইহাদের মূল্য নির্ধারণ করিতেছি না।

তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে অস্থায়ী উপাদানরাশির অন্তরালে থাকে ভাব—স্থায়ী ভাব এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। স্থায়ীর সূত্রে সঞ্চারী থাকে বাঁধা, স্থায়ী ও সঞ্চারীর মিলিত সূত্রে উপাদান বা বস্তুরাশি থাকে বাঁধা। সাহিত্যে এই উপাদান বা বস্তুই বিভাব, আলম্বন বা উদ্দীপন বিভাব। বিভাব ছাড়া সাহিত্য বা রস হয় না, তথাপি মূল রস-বিচারে বিভাব অস্থায়ী, ভাবের

উদ্বোধনেই তাহার প্রধান সার্থকতা। তুলনায় স্থায়ী হইতেছে ভাব। সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবও এক হিসাবে বিভাবের ন্যায় অস্থায়ী, স্থায়ী ভাবের অতিশয়তা বা অতিসম্পন্নতা-সাধনেই তাহার সার্থকতা। স্থায়ী ভাবের অন্তরালে তাহা অপেক্ষাও স্থায়ী, চিরস্থায়ী আত্মা, তাহাই আনন্দ, বোধময় সহজানন্দ। হাঁ, এই বোধময় আনন্দই সাহিত্যপাঠের শেষ সার্থকতা। বস্তু ধরিয়া বস্তুর গভীরে ভাবকে স্পর্শ করিতে হইবে, ভাবরাশির গভীরে স্থায়ী ভাবকে লাভ করিতে হইবে, তাহাতে তন্ময় হইতে হইবে, তাহারও গভীরে—অতিগভীরে বোধময় সহজানন্দের সাক্ষাৎ মিলিবে। তাহাই আসল স্থায়ী। সুস্থ শান্ত চিত্ত লইয়া তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। আপনাকে আপনি কি করিয়া অস্বীকার করিব? মনস্বী ক্রোচে যথার্থই বলিয়াছেন,—'troublous emotion' বা ভাব-চঞ্চল অবস্থা পার হইয়া 'profound penetration' বা গভীর অন্তঃপ্রবেশের ফলে 'pure poetic joy' অর্থাৎ বিশুদ্ধ কাব্যানন্দের প্রাপ্তি ঘটে। বিশ্বাস না হয়, 'স্বয়ং পশ্য বিচারয়'।

তাহা হইলে আসল স্থায়ী আবরণে-ঢাকা বোধময় আনন্দ। তাহারই সাক্ষাৎ সম্পর্কে স্থায়ী সেই সকল চিত্ত-ভাব, যাহা প্রীতি-ক্রোধ-শোক-ভয়ের ন্যায় সর্বমানব-সাধারণ এবং সর্বকাল-সাধারণ। এই স্থায়ী ভাব-সমূহের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসে অন্য অনেকগুলি ভাব, তাহারাই সঞ্চারী বা ব্যভিচারী বলিয়া পরিচিত। চিত্তভাব সম্বন্ধে কিছু পরিস্ফুট ধারণা না হইলে স্থায়ী ও সঞ্চারীর স্বরূপ বিচার ও বিশ্লেষণ করা যায় না; স্থায়ী ও সঞ্চারীর লীলাবিলাসও প্রত্যক্ষ করা যায় না। সে এক আশ্চর্য লীলা! সঞ্চারী স্থায়ীর অন্তরে, স্থায়ীর বাহিরে তো বটেই! সঞ্চারীর সম্পদেই স্থায়ীর অতিসম্পন্নতা ও বলভূয়িষ্ঠতা। এ যেন ঈশোপনিষদের কথিত বিদ্যা ও অবিদ্যার লীলা! অন্ধতমসে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবল সঞ্চারী বা অবিদ্যাকে ভজনা করে। গাঢ়তর অন্ধতমসে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবল স্থায়ী বা বিদ্যাকে ভজনা করে। আসল বস্তু স্থায়ী বা বিদ্যা হইতেও ভিন্ন, সঞ্চারী বা অবিদ্যা হইতেও ভিন্ন। স্থায়ী ও সঞ্চারী বা বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে যাহারা জানে, উভয়ের সাহায্যে তাহারা লাভ করে পরম অমৃত। বিদ্যা ও অবিদ্যার ঊর্ধ্বে পূর্ণ ব্রহ্মের ন্যায় স্থায়ী ও সঞ্চারীর ঊর্ধ্বে রহিয়াছে আসল স্থায়ী—পরম কাব্যামৃত।

শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত

পুরাতনের যৎকিঞ্চিৎ

জড়ধর্মী সভ্যতার অগ্রদূত ইংরেজের শাসনে ভারতবর্ষের স্বাধীন এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম-জীবনে ভাঙন ধরিয়া যে আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার পত্তন এখানে ওখানে হইয়াছে, তাহার ফলে আমাদের একূল ওকূল—দুইই যাইতে বসিয়াছে; গ্রামও গিয়াছে, নগরও ঠিকমত গড়িয়া উঠে নাই। আমরা নগরে তো অতিশয় অসহায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিই, গ্রামও আর আত্মনির্ভরশীল নাই। আমাদের পরধর্মপ্রবণতার বর্তমান ভয়ঙ্কর পরিণতি বর্ণনার অতীত। নগরের পথে ও বিপণিতে অনাবশ্যক বিলাসদ্রব্য অনশনক্লিষ্ট মানুষকে অহরহ আকর্ষণ করিতেছে, এদিকে একান্ত প্রয়োজনীয় আহার্যের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগের সম্ভাবনা ক্রমশই সুদূরপরাহত হইয়া আসিতেছে। তেল, চাল, আটা, দুধ, কয়লা, কেরোসিন, যাহা না হইলে মানুষের জীবযাত্রা নির্বাহ হয় না, সরকারী কন্ট্রোলের সুব্যবস্থায় সেগুলি সংগ্রহ করা যে কিরূপ সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। ইহার উপর আমাদের বাংলা দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও শাসনের শাকের আটি যুক্ত হইয়াছে, গলগণ্ডের উপর বিস্ফোটক ধর্মঘট তো আছেই। পশ্চিম হইতে আগত আমাদের বিবিধ বিপত্তির কথা প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে একজন বিলাত-প্রবাসী বাঙালী সন্ন্যাসী চিন্তা করিয়াছিলেন। আমাদের বর্তমান ঘোরতর সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিতরূপে তাঁহার পুরাতন কথাগুলিই আজ নূতন করিয়া স্মরণ করিতেছি। এই বিলাত-প্রবাসী সন্ন্যাসী বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা খ্রীষ্টপন্থী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মনীষী ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে আধুনিক সমস্যাগুলির সমাধান কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপনে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন—(হিন্দু অর্থে ভারতীয় বুঝিতে হইবে)—

"এখানকার গৃহস্থদের জীবনে শান্তি নাই। এত বেশী জিনিস-পত্তর দরকার যে তারা কুলিয়ে উঠতে পারে না। আর দিনকের দিন খুঁটি-নাটি বাড়ছে। এখানে ভদ্রলোকেরা ব্যস্ততার চক্রে পিষ্ট। জীবন ধীরে সুস্থে চালালে চলে না। যেন কেবলই ভিড় ঠেলে চলতে হয়। আমাদের দেশেও এইরূপ দুর্দশা

দাঁড়িয়েছে। তবে সেখানে এক মুষ্টি অন্নের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হয় আর এখানে সাপের খোলসের মতন চিকণসই পরদা ও দারা-সুতের নিমন্ত্রণ খাবার পোষাকের জন্য ছুটোছুটি করতে হয়। আমাদের যেমন এক মুষ্টি অন্ন তেমনি এদের পরদা ও বিলাস-বেশ—নইলে মানসম্ভ্রম একেবারে থাকে না। আর একটি বড় ভয়ের কথা। এখানকার কর্ম্মজীবী লোকেরা বড়-মানুষদের উপর বড় চটা। এরা ভাল লোক কিন্তু দায়ে পোড়ে বিদ্বেষভাবাপন্ন হোয়েছে। সভ্যতার বাজারে এত টানাটানি যে এরা সামলে উঠতে পারে না। তাই এরা বর্ত্তমান সমাজের দ্রোহী হোয়ে উঠছে। আর যাদের তেলা মাথায় তেল—এরা তাদের দেখে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে যায়। আমি এদের আমাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা অল্প স্বল্প বললাম। প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছেড়ে কৌলিক কর্ম্মকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা শুনে এরা বিস্মিত হ'ল কিন্তু তা যে শান্তিপ্রদ তা বার বার স্বীকার করলে। এরা বেশ শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্। এই সমাজদ্রোহিতা—সভ্যতার একটা অঙ্গ। এতেই ধর্ম্মঘট স্থাপন করে এবং ধনী ও কর্ম্মীতে শত্রুতা বাধায়। প্রতিযোগিতায় যার চালাকি আছে সেই খুব মেরে দেয় আর যে বেচারি ভাল মানুষ তার সহস্র সহস্র গুণ থাকলেও কিছু সুবিধা হয় না। এই সমাজের ভয়ানক অসামঞ্জস্য-ভীতি য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উৎকণ্ঠিত করে তুলছে। এই ত গেল ভয়ের কথা। সভ্যতার একটা শোচনীয় ব্যাপার আছে। সেটি ভয়ানক দারিদ্র্য। সহরে ভারি শোভা—পূর্ণমাত্রায় আয়েস ঐশ্বর্য্য; কিন্তু পশ্চাদ্ভাগের অলিতে গলিতে বড়ই দারিদ্র্য। দেখলে প্রাণ ফেটে যায়। ছোট ছোট পায়রার খোপের মতন ঘর—তাতে স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ের গাদাগাদি। ঘোর শীতে অগ্নি নাই—এখানে ঘরে আগুন নইলে তিষ্টিবার জো নাই—বস্ত্র নাই আহার নাই। সকলে কাজ করবার জন্য লালায়িত কিন্তু সহরে কাজ কর্ম্ম পায় না। এমন একজন আধজন নয়—শত শত সহস্র সহস্র। এই অমরাবতীর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে কত লোক শীতে ও অনাহারে প্রাণ হারাচ্ছে। কি দুঃখের কথা—কি লজ্জার কথা—আবার এমনি চমৎকার আইন যে ভিক্ষা করবার হুকুম নাই। রাস্তায় দেখতে পাবে যে দীনহীন রমণীরা ছেলে কোলে শীতে হি-হি কোরে কাঁপছে আর দুই একটা শুক্‌নো ফুলের তোড়া বা ভাঙ্গা দেশলাইয়ের বাক্স বিক্রী করবার ছল কোরে

ভিক্ষা চাইছে।- সে দিন দুইটী স্ত্রীলোকের কথা শুনে অশ্রুবারি সম্বরণ করতে পারি নাই। তারা দুটী বোন। একজন অনাহারে মরে পড়ে আছে, আর একজন ক্ষুধার জ্বালায় ক্ষেপে গেছে। পুলিশ এসে মরা ও ক্ষেপা দুজনকে বের করে নিয়ে গেল। এমন সভ্যতার মুখে ছাই। আমি ত দেখে শুনে ধিক্কারে মরি। আমার আলোকে কাজ নাই—আমার রংচংএ কাজ নাই। আমাদের অসভ্য দেশ অসভ্যই থাক্। শান্তি আমাদেরই ইষ্টদেবতা—ঠেলাঠেলি মারামারি আমাদের কাজ নাই। জিগীষার কাড়াকাড়ি হোতে ভগবান্ রক্ষা কর। হিন্দুসন্তান সভ্যতার প্রবৃত্তিপরায়ণতা হোতে বাঁচুক ও নিষ্কাম হয়ে কুল-ধর্ম্ম পালনে রত হোক।…"

"লালসার বহ্নিতে সমগ্র জাতিটা জ্বলিতেছে। আমাদের সংস্কারকেরা ইংরেজের ঈশ্বরত্ব দেখিয়া স্বদেশকে ধিক্কার দেন ও মনে করেন যে কি কুক্ষণে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুর প্রকৃতিজয়ের কথা বড় একটা বুঝেন না ও বুঝিতে চান না। হিন্দুর মুখ্য আদর্শ—নিবৃত্তি। প্রকৃতিকে জয় করিয়া নিষ্কাম হওয়া—ঈশ্বরত্বসম্পন্ন হওয়া—হিন্দুর পরম সাধন। ঈশ্বর হইতে গেলে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে হয়। যাহার প্রয়োজনীয় বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নাই সে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী নহে। কিন্তু যিনি স্বাধিকারের প্রাচুর্য্য ও বাহুল্যগুণে প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়াছেন তিনিই প্রভু—তিনিই ঈশ্বর—ঐশ্বর্য্যের স্বামী। প্রকৃতিকে ব্যবহারক্ষেত্রে জয় করিয়া—তাহাকে সেবাদাসী করিয়া কি ফল, যদি তাহার সঙ্গ ব্যতিরেকে শান্তিভঙ্গ হয়। এরূপ জয়—জয় নহে কিন্তু পরাজয়—কেবল দাসানুদাসত্ব স্বীকার করা। আমি যদি বিদ্যুৎকে ধরিয়া আনিয়া আমার দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি কিন্তু তাহার ক্ষিপ্র সংবাদ বহন বিনা রাত্রিতে আমার নিদ্রা না হয়, তাহা হইলে ধরিতে গিয়া কেবল ধরা পড়া হয় মাত্র। যদি কামানের গোলা বর্ষণ করিয়া নররক্ত পাত করিয়া মরুভূমির গর্ভ হইতে স্বর্ণ আহরণ করি—আর সে স্বর্ণ লইয়া স্বার্থের সহিত স্বার্থের ঘোর সংঘর্ষ ঘটে—সেই কাঞ্চন লইয়া মারামারি পড়িয়া যায়—সেই হেমপ্রভা—বিচ্যুত হইলে আমার শয্যাকণ্টকী পীড়া হয় তাহা হইলে পুরুষকার আর গোলামিতে কি প্রভেদ! হিন্দুর প্রকৃতিজয় ওরূপ নহে। প্রকৃতির বিবিধ উপকরণ দিয়া বাসনার নেশার মাত্রাটা চড়ানো হিন্দুস্বভাব-সুলভ নহে। হিন্দু নিঃসঙ্গভাবে প্রকৃতির সহিত ব্যবহার করা অভ্যাস করে। হিন্দুর নিকট তিনিই নরশ্রেষ্ঠ

যিনি ভূমা অনন্ত সর্ব্বময় একত্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নামরূপময় বহুত্বের মধ্যে ঈশ্বররূপে বিচরণ করেন। প্রকৃতি তাঁহার সেবা করে বটে কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে তিনি বদ্ধ নহেন। তিনি সকল সম্ভোগ সকল ঐশর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া আত্মস্থিত হইয়া বিরাজ করিতে পারেন। প্রকৃতি ঐশ্বর্য্য তাঁহার নিকট কেবল বাহুল্য মাত্র। উহার থাকা না-থাকা তাঁহার পক্ষে দুইই সমান। হিন্দু একত্বের ভিতর দিয়া বহুত্বকে দেখে—তাই সম্ভোগবিজড়িত বহুলতার প্রয়োজন তাহার চক্ষে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীত হয়। যেখানে পূর্ণ আত্মস্থিতি সেখানে অনাত্ম বস্তুর প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে না। নিষ্কাম ঈশ্বরত্ব লাভ হিন্দুর আদর্শ। আজ হিন্দুজাতি এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তথাপি পূর্ব্ব সাধনার লক্ষণ এখনও বর্ত্তমান। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে প্রকৃতির সঙ্গে অতি অল্পই প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। তাহার আচার-ব্যবহার আদান-প্রদান কঠোর সংযম দ্বারা নিয়মিত। সংসারের ভোগৈশ্বর্য্যকে লাঞ্ছিত করিয়া যেন তাহার দৈনিক কার্য্যের সমাধান হয়। হিন্দুর হয় সম্ভোগসামগ্রীর অল্পতা—সাদাসিধে চালচলন—নয়ত ছড়াছড়ি বাড়াবাড়ি বাহুল্য আড়ম্বর। প্রয়োজনের সুদীর্ঘ পরম্পরার নিগড় হিন্দুকে বাঁধিয়া রাখে না। কিন্তু য়ুরোপে ইহার বিপরীত ভাব। য়ুরোপীয় গৃহস্থের ঘরে খুঁটিনাটি সামগ্রীর আদি অন্ত নাই—সসাগরা পৃথিবী সেই ক্ষুদ্র নরদেবতাকে যেন করপ্রদান করিয়াছে। কিন্তু সেই সকল সামগ্রী গৃহস্বামীকে প্রয়োজনের রজ্জু দিয়া বাঁধিয়া রাখে। যা না ব্যবহার করিলেও চলে এমন বস্তু বড় একটা দেখা যায় না। সমস্তই কাজের তালিকায় লেখা। তথায় বাহুল্যের হিসাবে পেটিকায় পুঁজি করিবার অবসর অতি অল্পই আছে। য়ুরোপীয়ের ঘরে দেবাসুরবিজয়ী পঞ্চভূত অশেষ প্রকার রূপ ধরিয়া দাসত্ব করে বটে কিন্তু প্রবৃত্তির কোষাগার হইতে তাহাদের পাওনা গণ্ডা সুদে আসলে আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে না। প্রকৃতি যেমন ইংরেজের দাস আসলে সাহেবও তদ্রূপ প্রকৃতির দাস! বিলাত দেখিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে সভ্যতা সামাজিকতা লৌকতা আচার-ব্যবহার—এই সকল বিষয়ে হিন্দুজাতি ইংরেজ অপেক্ষা অনেক বড়। তবে ভারতের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে, তাই আজ অর্দ্ধশিক্ষিত ইংরেজ ভারতবাসীদিগকে সাহিত্য শিখাইতেছে ও দর্শনশাস্ত্র উপদেশ দিতেছে।"

অগ্নি

১৬

মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অংশুমান চুপ ক'রে শুনছিল।

হারুৎজ্ বলছিলেন, ব্যাটনের আঘাতটা তোমার মাথায় লেগেছে, তুমি কষ্টও পেয়েছ খুব—এ কথা আমি মানছি। আমি শুধু তোমাকে সেই পুরাতন সত্যটা আবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করতে বলছি যে, আমাদের অনুভূতির সীমানা বড় সংকীর্ণ। আমরা যতটা অনুভব করতে পারি, তার বাইরেও ঢের জিনিস আছে যা আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, যা আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর তারও রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায়। সাধারণ আলো রূপান্তরিত হয় ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণমহিমায় সামান্য একটা পরকলার ভিতর দিয়ে দেখলে। সুতরাং অনুভূতির বিশেষ একটা রূপকে আঁকড়ে ধ'রে কষ্ট পাওয়ার কোন অর্থ হয় না।

কষ্ট পাচ্ছি যে। যা পাচ্ছি তা মানতেই হবে।

আনন্দও পেতে পার, যদি তোমার অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে বিশেষ একটা পরকলার ভিতর দিয়ে চালিত করতে পার।

কোথায় পাব সে রকম পরকলা?

তোমার মনের ভিতরই আছে। খুঁজে দেখ। পরকলা শুধু কাচেরই হয় না, মানসিকতারও হতে পারে। একটা বিশেষ ধরনের মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়ে গেলে যন্ত্রণাও যে আনন্দদায়ক হতে পারে, তার প্রমাণ স্যাডিজ্‌মে। বিকৃত মনোভাব হিসেবে ওটা অনেকের কাছে ধিক্কৃত, বিজ্ঞানের কাছে কিন্তু কোন কিছুই ধিক্কৃত নয়। তা ছাড়া ইতিহাসে যাঁরা মার্টার ব'লে পূজো পান, তাঁরা কোনও অলৌকিক শক্তি-বলে শারীরিক বেদনাকে মানসিক বিলাসের পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারেন হয়তো। তোমাদের দেশেই সেকালে রাজপুতরমণীরা জহরব্রত করতেন, এখনও চড়কপূজোয় অনেকে পিঠের চামড়ায় লোহার বঁড়শী বিঁধিয়ে বাঁশের ডগায় ঝোলেন শুনেছি। এঁরা নিশ্চয়ই কোন উপায়ে যন্ত্রণাকে মাধুর্যে রূপান্তরিত করতে পারেন···তা না পারলে—

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন হারুৎজ্।

দেখ, স্নায়ুতন্ত্রীগুলো আঘাতের তরঙ্গগুলোকে বহন ক'রে নিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কে বেদনা-বোধের কেন্দ্রে আলোড়ন তোলে, তাই না আমরা বেদনা-বোধ করি। সেগুলো আনন্দ-বোধের কেন্দ্রে গিয়ে আলোড়ন তুললেই আমরা

আনন্দ-বোধ করব। যোগাযোগ ঘটানো অসম্ভব কি?…ঘনসন্নিবিষ্ট চাপ-দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন তিনি। ক্ষণপরেই আলো চকমক ক'রে উঠল চোখের দৃষ্টিতে।

দেখ, ফ্যারাডের স্বপ্নকে ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল ভাষা দিয়েছিলেন। তিনি অঙ্ক ক'ষে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, আলো আর বিদ্যুৎতরঙ্গ একই জাতের জিনিস, একই ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মের বিভিন্ন রূপ…ইলেক্‌ট্রিকাল লাইন্‌স্ অব ফোর্স একটি মিডিয়মে মাত্র চলে, তার নাম ঈথর—যা সর্বব্যাপী, যা প্রত্যেক জিনিসের অণুপরমাণুর অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট, অনেকটা তোমাদের উপনিষদের ব্রহ্মের মত এই ঈথর প্রত্যেক জিনিসকে প্রত্যেকের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ক'রে রেখেছে… এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তরঙ্গ বহন করে এই ঈথরই। আমি হাতে-কলমে প্রমাণ করেছিলাম সেটা। এখন আমাদের অনুভূতির তরঙ্গগুলোকে যদি ইলেক্‌ট্রোম্যাগ্‌নেটিক ওয়েভ ব'লে মনে কর, খুব সম্ভব তাই ওরা… তা হ'লে তাদের বহন করবার জন্যে স্নায়ুতন্ত্রীর প্রয়োজন নাও হতে পারে। সর্বব্যাপী ঈথর আছে। সুতরাং তার সাহায্যে বেদনার কম্পনগুলোকে আনন্দ-বোধের কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেই চেষ্টা কর তুমি। তোমাকে এই এক্‌স্‌পেরিমেণ্টটা করতে বলছি এই জন্যে যে, আঘাত পেলেই তুমি যদি কাবু হয়ে পড়, তা হ'লে যে পথ তুমি বেছে নিয়েছ সে পথে অগ্রসর হতে পারবে না; কারণ যে পথেই তুমি চল না কেন, আনন্দই হ'ল প্রধান পাথেয়। তোমার সশস্ত্র শত্রু অজস্র আঘাত করবে…ওই ওদের একমাত্র শক্তি…ওদের আঘাতকে তুমি যদি আনন্দে রূপান্তরিত করতে পার, তা হ'লেই তোমার জয়। পারবে না কেন?… Theoretically it is quite possible। আকাশের ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক তরঙ্গ রেডিও সেটে ঢুকে শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে, বেদনার অনুভূতিই বা আনন্দের অনুভূতিতে রূপান্তরিত হবে না কেন মস্তিষ্কের মত অমন একটা বিস্ময়কর যন্ত্রে প্রবেশ ক'রে? চেষ্টা কর, হবে ঠিক।

হার্‌ৎজ্‌ চ'লে গেলেন।

অংশুমান অন্ধকারে চুপ ক'রে বিমূঢ়ের মত ব'সে রইল। অকারণে আচমকা মার খাওয়ার পর থেকে তার সমস্ত মন কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। একটা হিংস্র পশুকে বন্দী ক'রেও লোকে তাকে এমন অকারণে মারে না। জেলে নাকি বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। কয়েকজন কয়েদী নাকি

জেলারকে তাড়া করে। ইলেক্‌ট্রিকের তার কেটে দিয়েছে। কর্তৃপক্ষের সন্দেহ, রাজনৈতিক বন্দীরাও সংশ্লিষ্ট আছে এতে। তাই এই শাসন।

একটা তপ্ত লৌহ-শলাকা কে যেন মাথার ভিতর ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছে ক্রমাগত। ঘুরিয়েই চলেছে…একদণ্ড বিরাম নেই…অসহায় পশুর মত সহ্য করতে হচ্ছে…উপায় নেই কোনও।

আনন্দে রূপান্তরিত করতে হবে। অসম্ভব যে নয় তা সে নিজেই জানে, কিন্তু নিজেকেও সে জানে যে! আঘাতের বদলে প্রতিঘাত করতে হয়—এই তার শিক্ষা। অপমানে জর্জরিত হয়ে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রতিঘাত করবে ব'লেই সে একদা যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, প্রবল বিরুদ্ধ-শক্তির নিষ্ঠুর চাপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা জেনেও। এই প্রত্যাশিত চাপে আর্তনাদ করছে কেন তবে? নির্বিকার থাকতে পারছে না কেন? নির্বিকারই থাকতে পারছে না যখন, আনন্দে রূপান্তরিত করবে কি ক'রে তাকে? হার্‌ৎজের এ উপদেশ পালন করবে কি ক'রে সে? পারলে যুদ্ধজয় সুনিশ্চিত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল সে। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ পরে যখন সচেতন হ'ল, তখন নিজের ক্ষুদ্রতায় সে সঙ্কুচিত। অযোগ্য অনুপযুক্ত। সামান্য পশু ছাড়া আর কিছু নয়। আঘাতের বদলে প্রতিঘাত দেবার অতি-পরিমিত সামান্য শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি তার নেই, তাই হাহাকার ক'রে মরছে সারাক্ষণ। মত্ত মাতঙ্গের পদতলে নিষ্পিষ্ট কীটের মতই মরতে হবে এবার। কীটের মতই মনোভাব, কীটের মতই দুর্বল, কীটের মতই মরতে হবে। আত্মিক শক্তি? মহাত্মা গান্ধী যে শক্তির উপর আস্থাবান, হার্‌ৎজ্‌ যে শক্তির কথা ব'লে গেলেন, সে শক্তির চর্চা তো সে করে নি কোনদিন। তার সন্ধানও জানে না। যে আত্মিক শক্তির বলে মানুষ পশুত্বের স্তর ছাড়িয়ে ঊর্ধ্ব-লোকে উঠে গেছে…হঠাৎ দধীচির কথা মনে পড়ল…নিজের অস্থি দান ক'রে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন…এটা কিসের রূপক?…অনেকক্ষণ এই কথাই ভাবলে সে। রূপকের মর্মোদ্ধার হ'ল না, সমস্ত অন্তর জুড়ে ঘনিয়ে উঠল একটা ক্ষোভ। যে ভারতবর্ষে তার জন্ম, সে ভারতবর্ষের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে। পাশবিক শক্তির তুচ্ছ আস্ফালনে মুগ্ধ হয়ে মনুষ্যত্বের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। পশু ছাড়া আর কিছু হয় নি সে। তাও অতিশয় হীন পশু…অতিশয় ছোট।

ছোট জিনিস তুচ্ছ নয়। আমি অদৃশ্য বিদ্যুৎতরঙ্গ ধরেছিলাম অতি ছোট একটি যন্ত্রের সাহায্যে। গ্যালিনার উপর সরু একটি তার…

আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখে প্রথমটা অবাক হয়ে গেল, তারপর সাহস হ'ল যেন। ঘোর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল অন্ধকারে, নির্ভরযোগ্য আত্মীয়ের দেখা পেয়ে শুধু যে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তা নয়, ম্লানায়মান আত্ম-বিশ্বাসের জ্যোতিটাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল সহসা অন্তরে। মনে হ'ল, পারব।

জগদীশচন্দ্রও বললেন, ভারতবাসী তুমি, নিজেকে হীন ভাবছ কেন এতটা? তুমি হীন নও, অমৃতের পুত্র তুমি। আদিত্যবর্ণ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করবার পূর্বে উপনিষদের ঋষিকেও তমসার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভয় কি, অন্ধকার থাকবে না, আলো দেখা দেবে, সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাক শুধু।

সত্যকে?—সাগ্রহে ব'লে উঠল অংশুমান, কোন্‌টা সত্য ব'লে দিন আমাকে। কাকে আমি আশ্রয় করব, আমি আশ্রয় খুঁজছি।

সত্য কি, তা কেউ কাউকে ব'লে বোঝাতে পারে না। নিজে সেটা উপলব্ধি করতে হয়। যেটা মিথ্যা ব'লে মনে হচ্ছে, সেইটে পরিহার ক'রে চল শুধু। সত্য-সন্ধানের সেই একমাত্র উপায়। অনেক মিথ্যা সত্যের মুখোশ প'রে থাকে, তাদের চিনতে দেরি হয়, কিন্তু সন্ধানী বেশি দিন প্রতারিত হয় না। রূপে রূপে বহু রূপে যিনি বিচিত্র, জীবনে ও মরণে যিনি নিত্য, সেই স্বয়ম্প্রভ স্বতন্ত্র সত্যের নির্লিপ্ত রূপ দেখতে পাবেই, যদি তোমার নিষ্ঠা আর আকুলতা থাকে।

আমি যে পথের পথিক, সে পথেও কি এই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রয়োজন? আমি চাই ক্ষমতা, শত্রুকে শাসন করবার শক্তি…

সত্যের কোন জাতিভেদ নেই। সত্যই শক্তি। আলোকে ভাসমান ধূলিকণা, পৃথিবীর অগণিত প্রাণী, আকাশের অসংখ্য প্রদীপ্ত সূর্য, শিকারের উপর ঝম্পনোন্মুখ শার্দূল, লজ্জাবতীর সঙ্কোচ, কুমুদিনীর নিশি-জাগরণ, বনচাঁড়ালের নৃত্য, উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন, চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত যা কিছু তা শক্তির বিকাশ, এবং তার মূলে আছে সত্য—একমেবাদ্বিতীয়ম্। তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, তাও এরই মধ্যে নিবদ্ধ। কোন পথই এর বাইরে নেই। যম নচিকেতাকে বলেছিলেন…তং দেবাঃ সর্বে অপিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন…

সকল দেবতা এঁর মধ্যেই প্রবিষ্ট…এঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। জড়, জীব, উদ্ভিদ, প্রাণী, বিদ্যুৎ, আলো সমস্ত অনুশীলন ক'রে সকলের মধ্যে যে বিরাট ঐক্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে বুঝেছি যে, আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তনশীল ব'লে মনে হ'লেও অন্তর্নিহিত সত্য এক এবং অভিন্ন। এবং এ উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, তিনি অজেয়।…

বলতে বলতে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল, যাচ্ছি যাচ্ছি, তোমারই কাছে, সত্যপথে অনিবার্য গতিতে…

তার পরদিন সকালেই অংশুমান খবর পাঠালে যে, সে দোষ স্বীকার করবে। তার স্বীকারোক্তি শুনতে এলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেন। ঠিক আগের দিন তিনি সদরে বদলি হয়ে এসেছিলেন।

১৭

শেষ রাত্রি।

ঘন কুয়াশায় চতুর্দিক সমাচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে পরিচিত ছিল, তা অবলুপ্ত হয়েছে। কুহেলিকা নয়, যেন প্রহেলিকা। জীবনের কোন লক্ষণ কোথাও নেই, বৈচিত্র্যহীন, সব একাকার। বিরাট একটা সাদা চাদর দিয়ে মৃতদেহকে মুড়ে রেখেছে যেন কে…চাদরটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অস্তমান শশীর পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় হাসি নেই, আছে সকরুণ আক্ষেপ। নীরব ভাষায় যেন বলছে, তোমরা যখন জাগবে তখন আমি থাকব না, আমার সময় ফুরিয়েছে, আমি চললাম। একটা সবেদন সান্ত্বনাও যেন ক্ষরিত হচ্ছে ম্লানায়মান সেই আলো থেকে। চন্দ্র অস্ত গেল। ধার-করা আলোর জ্যোতিটুকুও নির্বাপিত হ'ল। নিবিড় অন্ধকার। মনে হচ্ছে, সর্বগ্রাসী… কালের প্রবাহও থেমে গেছে…নিস্পন্দ অসাড় সব…বিরাট একটা অন্ধ জঠর গ্রাস ক'রে জীর্ণ করছে যেন চরাচর নিখিল বিশ্ব। আশার লেশমাত্রও আর অবশিষ্ট নেই ব'লে মনে হচ্ছে যখন, তখন অদ্ভুত কাণ্ড হ'ল একটা। তীক্ষ্ণ তীব্র সুরে বাঁশি বেজে উঠল অন্তরীক্ষে। সু-উচ্চ দেবদারুশাখাসীন শকুন্ত আলোকের অরুণাভাস দেখতে পেয়েছে পূর্বদিগন্তের চক্রবালরেখায়। এসেছে, সে এসেছে। নিস্পন্দ স্পন্দিত হ'ল, অসাড়ের সাড়া জাগল। নিষ্প্রাণ ঘুমন্ত পুরীতে লাগল যেন সোনার কাঠির স্পর্শ। সহস্র কিরণের সহস্র স্বর্ণশরজালে

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কুয়াশার মোহ-আবরণ। স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর হতে লাগল চতুর্দিক। পাহাড়ের চূড়া জাগল, দেখা দিল বনস্পতির শীর্ষদেশ, মন্দিরের ললাটে পড়ল আলোকের তিলক, কলরব ক'রে উঠল পক্ষীকুল বন থেকে বনান্তরে। ফুল ফুটল, হাওয়া বইল, অপরূপ বর্ণবিচ্ছুরিত শোভাযাত্রায় প্রবেশ করল আলোকের বিজয়-রথ। প্রভাত হ'ল।

১৮

মোটরের চারটে টায়ারই ফেটেছে।

পথের অনেকখানি জুড়ে ঘন ঘন লোহার পেরেক পোঁতা। আশেপাশে কোন গ্রাম নেই, চারিদিকে ধুধু করছে মাঠ। আমরা যে এই পথ দিয়ে যাব, তা কি ক'রে জানলে ওরা, কে ওদের খবর দিলে···ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একটু বিস্মিত হবার চেষ্টা করলেন নীহার সেন। ড্রাইভার টায়ার মেরামত করছিল, একটু ঝুঁকে সেটাতে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলেন, পট ক'রে হাফপ্যাণ্টের বোতাম ছিঁড়ে গেল একটা। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ঘাড় কপাল মুছলেন ভাল ক'রে। হাতঘড়িটা দেখলেন একবার। আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। সহসা চোখের উপর হাতটা একবার বুলোলেন, বুলিয়েই ভুলটা বুঝতে পারলেন। ছবিটা চোখের সামনে নেই, মনের ভিতর আঁকা হয়ে গেছে। কতকগুলো পা, মোটর-লরি থেকে ঝুলছে···মড়ার পা। মিলিটারির গুলিতে মরেছে। মোটর-লরিতে বোঝাই ক'রে এই কিছুক্ষণ আগে সেগুলোকে ফেলে আসা হ'ল ওই নদীতে। প্রকাণ্ড মাঠটার ওপর দিয়ে ব'য়ে গেছে নদীটা। সেই দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন নীহার সেন। যদিও নদীটা দেখা যাচ্ছিল না, দেখা যাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তবু চেয়ে রইলেন। পাগুলো ঝুলছিল···দশ-বারোটা পা। হঠাৎ রাগ হ'ল···অনির্দিষ্ট ধরনের রাগ। তারপর সেটাকে নির্দিষ্ট করবার চেষ্টা করলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁকেই কেন এ অপ্রীতিকর কাজটা দিলেন এত লোক থাকতে? তাঁকে বদলি ক'রে আনবার কি দরকার ছিল মফস্বল থেকে? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলছিলেন, তিনি বেশি কার্যদক্ষ—ক্রাইসিসের সময় 'এফিশেণ্ট' অফিসার দরকার। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে, মিলিটারিদের গুলি চালাবার হুকুম দেওয়া ছাড়া দক্ষতা দেখাবার আর কোন উপায় নেই। সত্যিই নেই···সবাই কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে···জেলের কয়েদীরা পর্যন্ত।

দু-দুজন জেলের অফিসারকে খুন ক'রে পুড়িয়ে ফেলেছে, ফায়ার করবার অর্ডার না দিলে কি রক্ষা ছিল কারও, সমস্ত জেলখানাটা পুড়িয়ে ফেলত। জন চল্লিশ মরেছে···বেশ হয়েছে···ক্রিমিনাল গুণ্ডা যত···আর একটু রাগবার চেষ্টা করলেন···কিন্তু পাগুলো আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে···দ্রুত-ধাবমান লরির পিছন থেকে ঝুলছে। রাগটা একটু ফিকে হয়ে গেল। মনে হ'ল, কই, এতদিন তো ওরা বিদ্রোহ করে নি, নিশ্চয় রাজনৈতিক বন্দীদের ষড়যন্ত্র আছে এর মধ্যে। অংশুমানের মুখটা মনে পড়ল। অদ্ভুত ছেলে। চোখের দৃষ্টিতে কোন উদ্বেগ নেই, ভয় নেই, উত্তেজনা নেই। পরিপূর্ণ শান্তিতে স্নিগ্ধ সে দৃষ্টি। নির্বিকার চিত্তে স্বীকার করলে যে, ডেপুটির অমানুষিক অত্যাচারে বিচলিত হয়ে সে তাকে পুড়িয়ে মারবার ষড়যন্ত্র করেছিল প্রতিশোধ নেবার জন্যে। এর জন্যে সে একটুও অনুতপ্ত নয়, এতদিন মিথ্যে কথা ব'লে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছে ব'লেই সে অনুতপ্ত। তার মৃত্যুর জন্যে সেই সম্পূর্ণ দায়ী, আর কাউকে জড়াতে সে চায় না। অকম্পিত কণ্ঠে স্বীকার করলে যে, সে একাই দায়ী; অকম্পিত হস্তে সই ক'রে দিলে স্বীকার-পত্রে। মুখের ভাব শান্ত, স্নিগ্ধ। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার উপায় নেই এদের। আগেও অনেকবার দেখেছিলেন একে তিনি, কতবার তাঁর বাড়িতেই এসেছে। মুখচোরা ভালমানুষ ব'লে মনে হ'ত। ভাবতেই পারা যায় নি তখন যে, এই লোক আগস্ট ডিস্টার্বেন্সের পাণ্ডা হয়ে জলজ্যান্ত একটা লোককে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। এতদিন ধ'রে ক্রমাগত দোষ অস্বীকার ক'রে এসেছে··· হিমসিম খেয়ে গেছে এতগুলো ঝানু দারোগা। সবাই হার মানল যখন, তখন হঠাৎ নিজে যেচে দোষ স্বীকার করছে। অদ্ভুত! ভয় পেয়ে করেছে যে, চোখের দৃষ্টি থেকে তা মনে হয় না। মিলিটারি ফায়ারিং হবার আগেই স্বীকার করেছে। না, ভয় নয়···আসলে ওরা···আর একটু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চিন্তা করতে লাগলেন, এই ধরনের লোককে ঠিক কোন শ্রেণীতে ফেললে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। কারও প্রতি অবিচার করতে চান না নীহার সেন, প্রত্যেক জিনিসকে ঠিক প্রপার পার্‌স্‌পেক্‌টিভে ফেলে বিচার করাই তাঁর রীতি···একটু ভেবে তাই ঠিক করলেন, না, ঠিক ক্রিমিনাল ওরা নয়, বাহাদুরি করবার জন্যেও এসব করে নি, আসলে ওদের মনের সমতা নেই, আন্‌ব্যাল্যান্‌স্‌ড্ মাইণ্ড···এরাই

বোধ হয় পাগল হয় শেষ পর্যন্ত। একটু দুঃখ হ'ল···ছেলেটা পড়াশোনায় ভাল ছিল নাকি···

আর কত দেরি হে ?

এখনও বহুৎ দেরি হুজুর। চার-চারটে টায়ার—। হাসিমুখে জবাব দিলে ড্রাইভার।

আকাশে বেশ মেঘ করেছে। ঘন-নীল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। ছেলেবেলার একটা কথা মনে প'ড়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তাঁদের একটা ময়ূর ছিল। মেঘ দেখলে ময়ূরটা পেখম তুলে নাচত, আর নাচত তাঁর ছোট বোন মালতী। গানও গাইত একটা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে··· আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে। ময়ূরটা উড়ে পালিয়ে গেল একদিন।···মালতীও মারা গেছে। হঠাৎ মনে হ'ল, বৃষ্টি হবে নাকি ? আকাশের দিকে চাইলেন একবার। শঙ্কা ঘনিয়ে এল চোখের দৃষ্টিতে। অসহায়ভাবে চারদিকে চাইলেন···ধুধু করছে ফাঁকা মাঠ···কোথাও আশ্রয় নেই···মনে হ'ল, আশ্রয় থাকলেও কেউ কি অভ্যর্থনা করত তাঁকে ? মোটরে উঠে বসলেন।

আকাশে বহু বিচিত্র মেঘ থাকলে আকাশটা যেমন চোখে পড়ে না, তেমনই নানা চিন্তার ভিড়ে আসল চিন্তাটা আড়ালে পড়েছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। অন্তরা চ'লে গেছে। কোথায়, কেন, কিছুই ব'লে যায় নি। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অপটুভাবে শিস দেবার চেষ্টা করলেন। হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা বাতাস উঠল একটা।

১৯

চাকরি ছাড়ার প্রস্তাবটাকে লঘু-হাস্যভরে উড়িয়ে দিলেন যখন নীহার সেন, তখন অন্তরার দাম্পত্য-নীড়ের শেষ খড়টুকুও যেন উড়ে গেল। যে ডালে সে নীড় ছিল, সেই ডালটাকে আঁকড়ে থাকবার আর কোন ওজুহাত সে আবিষ্কার করতে পারলে না। সেটা ভদ্রভাবে ত্যাগ ক'রে যাওয়াই স্বাভাবিক ব'লে মনে হ'ল তার। আদর্শকেই সে বরণ করেছিল, নীহার সেনকে নয়। নীহারের চেয়ে দেশই তার কাছে বড়। কোন ইজ্‌মের খাতিরে সে দেশদ্রোহী হতে পারবে না। প্রথম যৌবনে কমিউনিজ্‌মের যে স্বপ্ন তার কল্পলোকে মূর্ত হয়েছিল, তা আজও অম্লান আছে···সে কমিউনিজ্‌মের ভিত্তি দেশ—দেশেরই দরিদ্র জনসাধারণ। তাদের উপর গুলি চালাবার, তাদের অবলা নারীদের ধর্ষণ

করবার যে যুক্তি নীহারকে মুগ্ধ করেছে, সে যুক্তি নিয়ে নিজের মতে নিজের পথে সে একাই চলুক। প্রত্যহের কুশাঙ্কুর সহ্য ক'রে সে ও পথে সঙ্গী হতে পারবে না।···

একটা ছোট স্যুটকেসে নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সে গুছিয়ে নিলে। স্যুটকেসটা পরে ফেরত দিলেই হবে। কিছু টাকাও নিয়ে যাচ্ছে, সেটাও ফেরত দিতে হবে। চিঠিও লিখতে হবে একটা পরে। নীহার নিজের পথে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাক, আমি স'রে দাঁড়ালাম তার স্বাধীনতায় বাধা দিতে চাই না ব'লে—এই সব লিখতে হবে।···আরও অনেক কথা লিখতে হবে।···

রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু নীহারের কথাই মনে হতে লাগল বার বার। বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তর্কপটু, রাজনৈতিক নীহারকে নয়। সেই অসহায় পুরুষটাকে, যার অন্তরা না থাকলে একদণ্ড চলে না তাকে, যে দাড়ি কামিয়ে বুরুশটা ধুতে ভুলে যায়, হাত-ঘড়িটা হারায় ক্ষণে ক্ষণে, আপিসের কাগজ কোথায় রাখে ঠিক থাকে না। মনে পড়ছিল, মায়া হচ্ছিল ; কিন্তু আর ফিরবে না সে। মা-বাবাকেও সে কম ভালবাসত না, কিন্তু নীহারের জন্য তাদেরও ছেড়ে এসেছিল একদিন। আদর্শের জন্যেই নীহারকেও ত্যাগ করতে হ'ল। কষ্ট হচ্ছে···কিন্তু সে আর ফিরবে না। স্টেশনের দিকেই চলেছিল সে হাঁটাপথে। কোথায় যাবে ঠিক ছিল না। কলকাতাই যাওয়া যাক আপাতত। হঠাৎ মনে হ'ল, তার আদর্শকে রূপ দেবে কে ? অংশুমান ? সে তো নাগালের বাইরে, জীবনে আর হয়তো দেখাই হবে না। হঠাৎ বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠল। গতিবেগ বাড়িয়ে দিলে সে···দ্রুতবেগে চলতে লাগল অসমতল কঙ্করাকীর্ণ পথে। সমস্ত দেহ-মন একাগ্র হয়ে উঠল যেন। কেন, কিসের উদ্দেশ্যে, তা সে বুঝতে পারলে না। চলতে লাগল শুধু, দ্রুতবেগে চলাটাই একমাত্র করণীয় ব'লে মনে হ'ল। যেতে হবে···কোথায় সে আদর্শলোক জানা নেই···তবু যেতে হবে। চলতে লাগল। অনির্দিষ্ট নামহীন একটা আকর্ষণ দুনিবার বেগে টেনে নিয়ে চলল তাকে।

মনের প্রত্যন্ত প্রদেশে কিন্তু যে হাহাকারটা প্রচ্ছন্ন ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে লাগল, জীবনে সে কাউকে ভালবাসতে পারে নি, এক নিজেকে ছাড়া। সে ভালবাসা চেয়েছে, ভালবাসা পেয়েছে

ব'লে ভান করেছে, মাঝে মাঝে উতলা হয়েছে, স্বপ্নের ঘোরে স্বপ্নকে জড়িয়ে ধরতে গেছে···কিন্তু আসলে পায় নি কিছু। সত্যি যদি ভালবাসা পেত, তা হ'লে কেরানী স্বামী নিয়েও সুখী হ'ত সে। ভালবাসার স্পর্শে দাসত্বও মহনীয় হয়ে উঠত। হৃদয়-সিংহাসন শূন্যই আছে, কোনও মহারাজার স্পর্শে ধন্য হয় নি তা এখনও? কোথায় সে মহারাজা, কবে আসবে, কোন্ গুণে চেনা যাবে তাকে···। একটি গুণই তো সে চেয়েছে সারা প্রাণ দিয়ে, সারাজীবন শ্রদ্ধেয় হবে সে। যার পায়ে সমস্ত দেহ-মন উজাড় ক'রে দেব, তার মহত্ব যেন মেকি না হয়···দুদিন যেতে না যেতেই তার গিলটি ধরা না পড়ে। বিদ্বান নয়, বুদ্ধিমান নয়, ধনী নয়, রূপবান নয়, সে চেয়েছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে···যার মহত্বের ঔজ্জ্বল্যে মরচে পড়বে না কখনও। তখনই মনে হ'ল, তার নিজের কি এমন গুণ আছে যে, এমন খাঁটি সোনার দাবি সে করতে পারে অসঙ্কোচে? কি মূল্য দেবে সে···এর যোগ্য মূল্যই বা কি? মনের ভিতর থেকে উত্তর এল, আত্মত্যাগ। আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে সে। কিন্তু কোথায়··· কি ভাবে?···

আরে, রোকো রোকো—

গর্জন ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল মোটরটা।

মিসেস সেন? কোথায় চলেছেন? আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম যে আমি।

মোটর থেকে নাবলেন ইন্‌স্পেক্টর দ্বিজেন চক্রবর্তী।

একমুখ হেসে প্রশ্ন করলেন, কোথায় চলেছেন?

এই ট্রেনে কলকাতা যাব।

ও, তা হ'লে তো আরও সুবিধে হ'ল। আমিও যাচ্ছি কলকাতা। ট্রেনের এখনও দেরি আছে আধ-ঘণ্টা-টাক। স্টেশনে যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখাটা সেরে যাব ভেবেছিলাম। আপনিও কলকাতা যাচ্ছেন, ভালই হ'ল। আসুন তা হ'লে, উঠুন। স্টেশনেই যাওয়া যাক সোজা।···

আমার সঙ্গে কি দরকার আপনার?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে অন্তরা। তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল একটু।

বাদার ইন্টারেস্টিং·· ধীরে-সুস্থে বলব এখন। সঙ্গেই তো যাচ্ছেন, উঠুন। আপনার জিনিসপত্র কই?

এই ব্যাগটা ছাড়া আর কিছু নেই।

আসুন। মিস্টার সেন সদরে জয়েন করেছেন গিয়ে?

হ্যাঁ।

আপনি যাচ্ছেন কবে?

আমার কলকাতায় একটু দরকার আছে। সেটা সেরে তারপর যাব।

আই সি। আসুন।

ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধকার ভেদ ক'রে। ঠিক আগের স্টেশনে কামরাটা খালি হয়ে গেছে। ইন্‌স্পেক্টার দ্বিজেন চক্রবর্তী ও অন্তরা ছাড়া কামরায় আর কেউ নেই। একটা কপাট খারাপ, ভাল ক'রে বন্ধ হয় না। দ্বিজেনবাবু সেটাকে ভাল ক'রে খুলে দিয়ে তার সামনেই বসেছেন নিজের ট্রাঙ্কের উপর, ভালভাবে হাওয়া পাবেন ব'লে। তাঁর মনে হ'ল, এইবার কথাবার্তা শুরু করা যাক, পরের স্টেশনে আবার লোক উঠবে হয়তো।

একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে মিসেস সেন। আই হোপ, ইউ উইল স্পিক দি ট্রুথ—অংশুমান বাবুকে আপনি কি সাহায্য করেছিলেন কিছু?

অন্তরার চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল।

সাহায্য? কি রকম সাহায্য?

আর্থিক।

না।

ক্ষণকাল নীরব থেকে দ্বিজেন চক্রবর্তী বললেন, আমরা কিন্তু একটা বাড়ি সার্চ ক'রে এক সেট জড়োয়া গহনা পেয়েছি, তার প্রত্যেকটাতে নাম খোদাই করা আছে—অন্তরা সেন।

অন্তরার মুখ শুকিয়ে গেল। তবু সে সপ্রতিভ হাসি হেসে বললে, আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য অন্তরা সেন থাকাও সম্ভব।

কোয়াইট, খুবই সম্ভব। আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু যে দোকান গয়নাগুলো বিক্রি করেছে, গয়নার গায়ে দোকানের নামও ছিল, সেখানে খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে, এক আপনি ছাড়া অন্য কোন অন্তরা সেনকে গয়না বিক্রি করে নি তারা।

আমার সে গয়নার 'সেট' চুরি গেছে।

কবে ?

ঠিক মনে নেই।

পুলিসে খবর দিয়েছিলেন ?

না।

দেন নি কেন ?

পুলিসের উপর আস্থা নেই ব'লে।

আপনার স্বামী কি এই চুরির কথা জানতেন ?

তিনি রাগারাগি করবেন এই ভয়ে তাঁকেও জানাই নি।

দ্বিজেন চক্রবর্তীর মুখ হাস্য-প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে উঁকি দিতে লাগল প্রচ্ছন্ন কৌতুক। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। আড়চোখে চেয়ে দেখলেন, অন্তরার দৃষ্টিতে আগুন জ্বলছে। এক ঝলক হেসে বললেন, কিন্তু আপনার বান্ধবী কমরেড মীনা দত্তকে এসব কথা লেখেন নি তো ?···সে চিঠিখানাও দেখেছি আমি।···

অন্তরার চোখ দুটো দপ ক'রে জ্ব'লে উঠল।

দ্বিজেনবাবু বললেন, আই অ্যাম সরি, কিন্তু আপনাকে অ্যারেস্ট করতে হ'ল। কর্তব্যের খাতিরে, বিলিভ মি। মিস্টার সেন, আই হোপ, উইল অ্যাপ্রিসিয়েট মাই লাভ ফর ডিউটি।

একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল চোখ দুটোতে। অন্ধকার ভেদ ক'রে ট্রেন ছুটতে লাগল।

২০

অন্ধকারে একা ভাবছিল অংশুমান।

···ওরা ছাড়বে না, প্রতিশোধ নেবে। বার বার নিয়েছে, এবারও ছাড়বে না। ছাড়বে না, কারণ ওরাও ভীত। ভীত বন্য বরাহ যেমন দুরন্ত বেগে তেড়ে আসে, নখদন্ত বিস্তার ক'রে বাঘ যেমন সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আততায়ীর বুকে, সাপ যেমন ফণা তোলে, এরাও তেমনই নিষ্ঠুরভাবে নির্মূল করবে আমাদের। ভয় পেয়েছে ব'লেই অস্ত্র চালাবে, চোর যেমন ছোরা চালায়। না, ছাড়বে না। কখনও ছাড়ে নি। ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে।···

···গাছের ডালে ডালে মড়া ঝুলছে। ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।

···হাত-পা-বাঁধা সারিবদ্ধ সিপাহী। একের পর এক গুলি করা হচ্ছে। মড়ার স্তূপ। দুটো কূপ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

···প্রকাণ্ড একটা কামান দাগা হ'ল। আওয়াজটা হ'ল চাপা গোছের, সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে পড়ল চতুর্দিকে মাংসের টুকরো, কাটা আঙুল, রক্তাক্ত হাত-পা, ঝলসানো থ্যাঁতলানো মাথা। কামানের ভিতর মানুষ পুরে কামান দাগা হয়েছে।

···একটা পোড়া দুর্গন্ধ উঠছে চতুর্দিকে। একটা জীবন্ত লোককে হাত-পা বেঁধে মন্দ আঁচে ধীরে ধীরে পোড়ানো হচ্ছে। তার আগে তাকে প্রহার করা হয়েছে প্রচুর। বেয়নেটের খোঁচায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত।

···একটা লম্বা ঘরে সারি সারি শোয়ানো আছে হাত-পা-বাঁধা অপরাধীরা। সকলেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তপ্ত লোহা দিয়ে আপাদমস্তক দেগে দেওয়া হচ্ছে সকলের একে একে। চড়চড় ক'রে শব্দ হচ্ছে—তপ্ত লোহায় কাঁচা মাংস পুড়ছে। নিদারুণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে সকলে। আর্তনাদ যখন বিরক্তি উৎপাদন করতে লাগল, তখন গুলি চালিয়ে নীরব ক'রে দেওয়া হ'ল তাদের।

···মুসলমানের মুখে জোর ক'রে মাখানো হচ্ছে শূকরের চর্বি, শূকরের চামড়ায় পুরে সেলাই করা হচ্ছে তাদের, তারপর হত্যা করা হচ্ছে নির্মমভাবে। ফাঁসি দিয়ে, গুলি ক'রে, কামানের ভিতর পুরে, পুড়িয়ে, ঠেঙিয়ে,—যেমন খুশি। হিন্দুর বেলাতেও ঠিক অনুরূপ আচরণ। আগে ধর্ম নষ্ট, তারপর অপমান, তারপর হত্যা।

দিল্লী শ্মশান হয়ে গেছে। একটি পুরুষ নেই। সব মরেছে। হাজার হাজার গৃহহীন স্ত্রীলোক আর শিশু ঘুরে বেড়াচ্ছে পথে পথে। সৈন্যরা ঘরে ঘরে ঢুকে লুঠ করছে···

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইংরেজ রাজপুরুষেরা যেভাবে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন, তার এই সব বর্ণনা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরাই* নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। ভয়াবহ বর্ণনা। অনেকদিন আগে পড়েছিল। প্রতিটি বর্ণনা মূর্ত হয়ে উঠতে লাগল চোখের সামনে। এদেশের লোককে লাথি মেরে, চাবকে, জেলে পুরে, গুলি ক'রে, ফাঁসি দিয়ে, আগুনে পুড়িয়েও তৃপ্তি হয় নি

* *The Other Side of the Maled* by Edward Thompson

এদের। একজন লিখেছেন—আমার যদি আইনত ক্ষমতা থাকত, জীবন্ত অবস্থায় এদের চামড়া ছাড়িয়ে নিতাম। তারপর দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, কাবুল বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহও দমন করেছিলেন এঁরা গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে, হাজার হাজার লোক হত্যা ক'রে। শক্তিমান জাতি, প্রতিশোধ নিতে এরা ছাড়ে না। জালিয়ানওয়ালাবাগ, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, ভারতবর্ষের প্রত্যেক জেলের সেলে সেলে···। সহসা চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল অংশুমান, তবু ভয় খাব না, তবু অন্যায় সহ্য করব না, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য আমরা নেবই। ব'লেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল—কোথাও কেউ নেই। চুপ ক'রে ব'সে রইল অনেকক্ষণ। অন্ধকার—কেবল অন্ধকার। এত অন্ধকার কেন? একটু আলো, এতটুকু আলো পেলে যে বেঁচে যায় সে। কোথাও আলো নেই। চোখের সামনে অন্তরের নিবিড় গহনে কেবল অন্ধকার। ঘন গাঢ় পুঞ্জীভূত তমিস্রা। মৃত্যুর আঁধার এখনই নামল নাকি?···

শান্ত স্তব্ধ হয়ে চোখ বুজে ব'সে ছিল অংশুমান। চোখের সম্মুখে প্রসারিত তিমির-যবনিকা সামান্য একটু কাঁপল যেন, ক্ষীণ একটু আলোর আভাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।···আবার অন্ধকার···একটু পরে আবার সেই আলোর আভাস, এবার যেন একটু বেশিক্ষণ-স্থায়ী···আবার মিলিয়ে গেল তাও। একাগ্র আগ্রহে স্তব্ধ নিমীলিত নেত্রে ব'সে রইল অংশুমান। প্রদীপের শিখার মত ওই যে...স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল ক্রমশ···কম্পিত শিখা স্থির হ'ল। সহসা সে শিখা থেকে আবির্ভূত হলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। বললেন, ভয় কি, আমি আছি। অন্ধকার মিথ্যা।···

কে আপনি?

আমি অনির্বাণ অগ্নি। তোমার মধ্যে চিরকাল আছি এবং থাকব। ভয় আমাকে আবৃত করে, কিন্তু ধ্বংস করতে পারে না। ভয় অপসারিত কর, আমাকে দেখতে পাবে। ভয়ই অন্ধকার।···

ধীরে ধীরে শিখার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন আবার।

অংশুমানের কানে কানে কে যেন বলতে লাগল, আমি দাবানল, আমিই বাড়বানল, আমিই আবার কৃশানু। মৃন্ময় প্রদীপের ভীরু কম্পিত শিখায়, বিদ্যুতের উজ্জ্বল প্রকাশে, ইন্দ্রের বজ্রে, মদনের কুসুমশরে, নক্ষত্রের কিরণে,

খদ্যোতের দীপ্তিতে, তপস্বীর তপস্যায়, প্রেমিকের প্রেমে, কবির প্রেরণায়, বীরের বীরত্বে, বৃক্ষে লতায় জড়ে চেতনে অণুতে পরমাণুতে সর্বত্রই আমার প্রকাশ। ইলেকট্রনের যে রূপে তোমরা বিস্মিত, তা আমারই রূপ। নেগেটিভ ইলেকট্রন চিরকালই পজিটিভের দিকে ধাবিত। আমারই এক অংশ আর এক অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণ হতে চায়। স্বাহা আজও আমার অনুগামিনী···তাই পৃথিবী অজর অমর অক্ষয় শাশ্বত···

নিস্তব্ধ হয়ে গেলে সব।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন উঠল···যাচ্ছি···যাচ্ছি···তোমারই কাছে···অনিবার্য-গতিতে···সত্য পথে···

২১

তিন মাস কেটে গেছে।

সব রকম চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। অংশুমানকে পাগল প্রতিপন্ন করা যায় নি। হাইকোর্টের বিচারেও তার প্রাণদণ্ড বাহাল আছে। প্রাণভিক্ষা চেয়ে একটা দরখাস্ত করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন হিতৈষীরা। অংশুমান তাতে সই করে নি। অংশুমানের বাবা পুত্রের জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন রাজদরবারে। মঞ্জুর হয় নি। কাল ভোরে অংশুমানের ফাঁসি হবে। জেলারবাবু এসে প্রবেশ করলেন।

আপনার শেষ ইচ্ছা যদি কিছু থাকে বলুন, তা আমরা সম্ভব হ'লে পূর্ণ করতে চেষ্টা করব। মানে, যদি কারও সঙ্গে দেখা-টেখা করতে চান—

কার সঙ্গে দেখা করবে সে? মা বাবা? কি হবে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে? তারা তো খালি কাঁদবে। অজানা পথে অশ্রুর পাথেয় নিয়ে কি করবে সে? হঠাৎ মনে হ'ল···যদি···

একজনের দেখা পেলে সুখী হতাম, কিন্তু তা কি সম্ভব হবে এখন?

কার সঙ্গে বলুন, চেষ্টা করতে পারি।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নীহার সেনের স্ত্রী অন্তরা দেবীর সঙ্গে।

তিনিও তো আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন।

মানে?

সবিস্ময়ে চেয়ে রইল অংশুমান।

কাল তাঁরও ফাঁসি হবে।

কেন, কি করেছিল সে ?

একজন পুলিস অফিসারকে ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন ? দেখি—

জেলারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

২২

সেদিন পূর্ণিমা।···শেষ রাত্রি। সামনেই ফাঁসির মঞ্চ। অন্তরা পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। অংশুমান মৃত্যুর কথা ভাবছিল না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সে। অনাবিল জ্যোৎস্নায় মহাকাশ পরিপ্লাবিত। পৃথিবীর ধূলিতে লেগেছে আকাশের স্পর্শ, জেগেছে অনাগতলোকের স্বপ্ন। রূপসাগরের কানায় কানায় অপরূপ সৌন্দর্য-সুধা যেন টলমল করছে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উড়ে যেতে চাইছে যেন পৃথিবী দৃষ্টির ওপারে চক্রবালরেখা ছাড়িয়ে। ওটা মেঘ নয়—নৌকোর পাল···ভারতের স্বর্গীয় অমরবৃন্দ বোধ হয় যাত্রা করেছেন আজ মর্ত্যের দিকে···ক্ষুদিরাম-কানাইলালের দল···ওটা তাদেরই পাল-তোলা নৌকো···পালে লেগেছে পারিজাতগন্ধী হাওয়া···দুলছে তাতে নন্দনবনের মন্দারমঞ্জরী···

শেষ

"বনফুল"

মহাস্থবির জাতক

(পূর্বানুবৃত্তি)

বললুম, নিশ্চয় মনে থাকবে।

ওদিকে আমাদের চারদিকে ভিড় ও সেই সঙ্গে কোলাহল বাড়তে আরম্ভ করলে। সেই তালে ভদ্রমহিলাও চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলেন। শেষকালে আর থাকতে না পেরে আমার নাম ধ'রে ডেকে বললেন, দেখ তো বাবা, উনি গেলেন কোথায় ? বোধ হয় এই ইষ্টিশান-মাস্টারের ঘরে ব'সে আড্ডা দিচ্ছেন। আড্ডা পেলে আর কিছু মনে থাকে না। এই মানুষকে ফেলে গিয়ে কি ক'রে আমার দিন কাটে তা ভগবানই জানেন। ওদিকে বাবার যে কি কষ্ট! তোমরা যে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাও নি—বেঁচে গেছ। মেয়েমানুষের মনের কষ্ট মেয়েমানুষ ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না।

যা হোক, মেয়েমানুষের কষ্ট বোঝবার আর অধিক চেষ্টা না ক'রে আমি

উঠে প্ল্যাট্‌ফর্মে ঢুকে স্টেশন-মাস্টারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। দেখলুম, ঘরের মধ্যে একটা গোল টেবিল ঘিরে রেল-কোম্পানির কালো কোট ও গোল টুপি পরা জন তিনেক লোক ব'সে আছে, আর আমাদের ইনি দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রে হিন্দী ভাষায় তাদের কি সব বলছেন, আর তারা থেকে থেকে হাসিতে ফেটে পড়ছে।

দরজার কাছে আমি দাঁড়িয়েই আছি, ভদ্রলোক একবার ফিরেও দেখেন না। হঠাৎ একবার চোখে চোখ পড়তেই তিনি ঘরের ভেতর থেকেই চীৎকার ক'রে উঠলেন, এই যে ভায়া!

তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, তুমি বোধ হয় মনে করলে, শালা টিকিট দুখানা নিয়ে স'রেই পড়ল। আরে, সরব কোথায়, আমার সর্বস্ব যে তোমাদের কাছে জিম্মে ক'রে এসেছি। পালাবার কি আর পথ আছে!

ব'লেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

বললুম, না না, তা নয়। আমি সেজন্যে আসি নি, মানে, আপনার স্ত্রী ডাকছেন আপনাকে।

ও! ডাকছেন বুঝি আমাকে ? বলগে, এক্ষুনি আসছি আমি, কোন ভয় নেই, ট্রেন খুব লেট।

আমি চ'লে আসছি, এমন সময় ভদ্রলোক আমাকে ডেকে বললেন, ভায়া, শোন।

কাছে যেতেই বললেন, স্টেশন-মাস্টারকে টিকিট দুখানা দেখালুম, সে বললে, ঠিক আছে।

তারপরে কোটের ভেতর থেকে একটা ব্যাগ বের ক'রে আমাকে বললেন, এখান থেকে হাওড়ার দুখানা টিকিটের দাম হয় ছ-টাকা ক আনা। আমি তোমাকে পাঁচটি টাকা দিচ্ছি ব্রাদার।

ব্যাগ থেকে পাঁচটি টাকা বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে বললেন, কেমন, খুশি তো ? এতে তোমাদেরও কিছু হয়ে গেল, আমারও কিছু লাভ হ'ল। ভাই, বিদেশে ডাকঘরে কেরানীগিরি করি, এই ক'রেই চালিয়ে নিতে হয়। রাগ করলে না তো ?

বললুম, না না, রাগ করব কেন ? আপনি আমাদের উপকারই করলেন।

ফিরে আসছিলুম, আমাকে ডেকে বললেন, ভায়া, আমার স্ত্রীকে এসব কথা ব'লো না যেন।

না না, কি দরকার!—ব'লে টাকা কটি ট্যাকে গুঁজতে গুঁজতে ফিরে এলুম। অপ্রত্যাশিতভাবে টাকা পাঁচটি পেয়ে বুক যেন দশ হাত হয়ে গেল। প্রহার ও অনাহারজনিত শারীরিক গ্লানি যে কোথায় উবে গেল, কি বলব! অর্থ এমনই সালসা!

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখি, পরিতোষের বাঁ হাতের তেলোয় পর্বতপ্রমাণ লুচির দিস্তে, তার ওপরে চুড়োর মতন খানিকটা তরকারি। তার চোয়াল দুটো ঢেঁকির মতন উঠছে আর পড়ছে।

আমি কাছে আসতেই রাণুমা বললেন, তুমি তো বড় দুষ্টু ছেলে বাছা! সারাদিন খাওয়া হয় নি, এ কথা মাকে বলতে হয়! কি রকম ছেলে তুমি আমার?

দস্তুরমতন মিলিটারি সুরে আমায় হুকুম করলেন, ব'স এখানে।

পরিতোষের পাশে ব'সে পড়লুম। রাণুমা একটা বড় গোল পেতলের কৌটো-গোছের বাক্স খুলে তার ভেতর থেকে এক তাড়া লুচি ও খানিকটা আলু-প্যাজের চচ্চড়ি তার ওপরে চাপিয়ে আমাকে দিয়ে বললেন, খাও।

সারাদিন অনাহারের পর সে খাবার যে কি ভাল লাগল, তা কি ক'রে বোঝাব! প্রতি গ্রাসে মনে হতে লাগল, যেন ছ মাসের পর পথ্যি পাচ্ছি।

রাণুমা বকবক ক'রে ব'কে যেতে লাগলেন। জানি না, এরই মধ্যে পরিতোষ তাঁকে কি বলেছিল! তিনি বলতে লাগলেন, শখ ক'রে এ কষ্ট ভোগ করা কেন? ভাল ঘরের ছেলে তোমরা, এত কষ্ট কি সহ্য হবে? আমি যদি এখানে থাকতুম, তা হ'লে নিশ্চয় ধ'রে নিয়ে যেতুম তোমাদের, ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে বাইরে প্ল্যাটফর্মে ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টা বেজে উঠল। ওদিকে ঘরের ঘুলঘুলি গেল খুলে, আর সেখানে শুরু হ'ল গুঁতোগুঁতি আর হুড়োহুড়ি।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদে রাণুমার স্বামী অর্থাৎ সম্পর্কে আমাদের রাজাবাবা হন্তদন্ত হয়ে এসে ব্যাপার দেখে স্ত্রীকে বললেন, কি লাগিয়েছ?

রাণুমা নির্বিকারভাবে বললেন, ছেলেগুলোকে খাওয়াচ্ছি। সারাদিন না খেয়ে আছে, তা বাছারা কি আমায় আগে বলেছে! কথায় কথায় বার ক'রে নিলুম।

ভদ্রলোক মুখে একটা ঔদাস্যের ভাব এনে ফরাসী কায়দায় হাতের তেলো দুটোকে চিতিয়ে এক ভঙ্গী ক'রে মুটেদের দিকে ফিরে বললেন, এইজন্যেই শাস্ত্রে বলেছে—মেয়েমানুষ নিয়ে পথে বেরুতে নেই।

ভদ্রমহিলা স্বামীর দিকে মুখ তুলে বললেন, তা নিয়ে বেরুলে কেন? একলা পাঠিয়ে দিলেই হ'ত।

ভদ্রলোক স্ত্রীর কথার কোন জবাব না দিয়ে সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলে মুটেকে বললেন, ওরে, এই বিছানাটা তুলে নে।

মুটের পেছু পেছু তিনিও প্ল্যাটফর্মে ঢুকে গেলেন।

পরিতোষের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আমি তাড়াতাড়ি ক'রে গিলতে আরম্ভ করেছি দেখে রাণুমা বললেন, তাড়াতাড়ি ক'রো না বাবা, ধীরে-সুস্থে খাও।

মিনিট দু-তিন যেতে না যেতে আমাদের রাজাবাবা লাফাতে লাফাতে এসে বললেন, ওগো, উঠে পড়, সিগ্‌ন্যাল প'ড়ে গেছে।

রাণুমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, পড়ুকগে শিংগেল, পোড়ারমুখোরা এতক্ষণ করছিল কি! ছেলেগুলোকে খেতে দিয়েছি, এখন যত রাজ্যের শিংগেল পড়বার তাড়া লেগে গেল!

আমি ততক্ষণে বাকি দু-তিনখানা লুচি ও তরকারিটুকু ঠেলে মুখগহ্বরে পুরে দিয়ে সেগুলিকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করতে লাগলুম।

রাণুমা কিন্তু স্বামীর তাগাদায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আবার বালতিটা টেনে এনে তার ভেতর থেকে আর একটা কাপড়ে-মোড়া কৌটো বার ক'রে ন্যাকড়ার গাঁট খোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ওদিকে ব্যাপার দেখে রাজাবাবা পাছা চাপড়ে একরকম নৃত্য করতে করতে গলা দিয়ে একটা অস্বাভাবিক সরু ও করুণ সুর বের ক'রে গান শুরু ক'রে দিলেন। গানের ভাষা হচ্ছে—হায় হায়! আজ নেঘ্‌ঘাৎ ট্রেন ফেল করালে দেখছি—

রাণুমা নির্বিকার। স্বামীর নৃত্যগীতে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ধীরে-সুস্থে ন্যাকড়ার গাঁট খুলে বড় কৌটোর ভেতর থেকে আর একটা ছোট কৌটো বের ক'রে সেটার ঢাকনা খুলে দুটো প্যাড়া বের ক'রে আমাদের দুজনের হাতে দিয়ে আবার কৌটো বাঁধতে লাগলেন।

রাজাবাবা আর সহ্য করতে না পেরে হেঁট হয়ে পরিতোষের একখানা

হাত ধ'রে বললেন, চল ভায়া, প্ল্যাট্‌ফর্মের কলে তোমাদের জল খাইয়ে আনি।

আমরা দাঁড়িয়ে উঠলুম। ভদ্রলোক তাড়া দিয়ে মুটের মাথায় সেই বিরাট ট্রাঙ্ক তুলে দিয়ে বালতিটা টপ ক'রে হাতে নিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকে দৌড় দিলেন।

প্ল্যাট্‌ফর্মে পৌছবার পূর্বেই বিরাট গর্জন করতে করতে ট্রেন এসে উপস্থিত হ'ল। জল খাওয়া তখনকার মতন বন্ধ ক'রে ছুটোছুটি ক'রে খালি কামরার খোঁজ করতে লাগলুম। ট্রেনে বেশি ভিড় ছিল না। একটা দু-বেঞ্চিওয়ালা সরু কামরা খালি আছে দেখে সেইটেতে তুলে দিয়ে আমরা দরজার কাছে দাঁড়ালুম। গাড়ি বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না, জল পরে খেলেও চলবে।

রাজাবাবা মুটে বিদেয় করতে করতে রাণুমা জিনিসপত্র গুছিয়ে জানলার ধারে এসে বসলেন।

আবার ঢং-ঢং ক'রে কতকগুলো ঘণ্টা পড়ল। রাজাবাবা আমাদের বললেন, ভাগ্যে ভায়ারা ছিলে, তাই তাড়াতাড়ি উঠতে পারলুম।

রাণুমা স্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, ভায়া আবার কি! ওরা আমার ছেলে যে!

ওঃ, ছেলে নাকি? তা আগে বলতে হয়। জানো বাবা, তোমাদের এই মা একটু রাগী মানুষ বটে, কিন্তু মনটা বড় ভাল—

তুমি থাম।—ব'লে রাণুমা আমার নাম ধ'রে বললেন, কলকাতায় গিয়েই দেখা করবে, ওই পরিতোষ ছেলের কাছে ঠিকানা-পত্র সব লিখে দিয়েছি, রাণুমাকে ভুলো না যেন—

বলতে বলতে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

রাণুমাকে ভুলি নি, নিশ্চয় ভুলি নি। তবে তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা আর হয়ে ওঠে নি। মাস দেড়েক বাদে কলকাতায় ফিরে এসেছিলুম বটে, কিন্তু পরিতোষের বাবার তখন খুবই অসুখ। বোধ হয় সপ্তাহখানেক বাদেই তারা চ'লে গেল পশ্চিমের এক শহরে হাওয়া বদলাতে। আমি যাই যাই করতে করতে দিন পনেরোর মধ্যেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়লুম একজ্বরে। অনভ্যাস-অত্যাচারের শোধ প্রকৃতি সুদে-আসলে তুলে ছাড়লেন। রোগশয্যা ত্যাগ করবার কিছুদিনের মধ্যেই আবার আমাকে বেরুতে হ'ল পথের আহ্বানে।

রাণুমার সঙ্গে জীবনে আর দেখা হয় নি বটে, কিন্তু রাণুমাকে ভুলি নি। অতীত দুদিনের পটভূমিতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অকস্মাৎ সূর্যোদয়ের মতন প্রসন্নময়ী সেই মাতৃমুখ মনের মধ্যে ফুটে উঠছে আর শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ছে। দূর অতীতের সেই এক সন্ধ্যায় প্রহারজর্জর, ক্ষুৎপিপাসাকাতর এই দুটি বালকের মুখে অযাচিত অন্ন দিয়ে যে রক্ষা করেছিল, তাকে কি কখনও ভুলতে পারি! জীবনের সেই দারুণ দুঃসময়ে হঠাৎ-পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া মাকে আজ আমি প্রণাম জানাচ্ছি। বন্ধু পরিতোষ আজ কাছে নেই, তার হয়েও আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। জানি, আমাদের নিবেদন ব্যর্থ হবে না।

ট্রেনখানা প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকে বেরিয়ে যেতে না যেতে টপটপ ক'রে আলোগুলো সব নিবিয়ে দেওয়া হ'ল। প্ল্যাট্‌ফর্মের কলে আকণ্ঠ জল পান ক'রে আবার আমরা যাত্রীগৃহে ফিরে এলুম। বোধ হয় মিনিট পনেরোর মধ্যেই চারিদিক একেবারে নিষুতি হয়ে পড়ায় আমরা দুটো বেঞ্চি দখল ক'রে ঘুমের সাধনায় মন দিলুম।

ঘুম জিনিসটা প্রাণী-জগতে ঈশ্বরের এক অদ্ভুত দান। সন্ধ্যায় যে মাতা উপযুক্ত পুত্র হারিয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে শেষরাত্রে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সে ঘুমের কোলে ঢ'লে পড়ে—আমরা তো কোন্ ছার! সারারাত্রি কখনও ঘুম কখনও জাগরণ, এই করতে করতে রাত্রি ভোর হয়ে গেল।

সকালবেলা দু-তিন কাপ চা খেয়ে ধাতস্থ হয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের কলে স্নান ক'রে র‍্যাপার প'রে ধুতি শুকিয়ে নিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে চায়ের দোকান থেকে দুজনে আধ সের ক'রে দুধ মেরে বেরিয়ে পড়া গেল অনির্দিষ্ট যাত্রায়। ট্যাঁকে টিকিট-বিক্রয়লব্ধ পাঁচটি টাকা, কাছায় বাঁধা একটি আংটি আর পরিতোষের পকেটে কয়েক আনা, এই মাত্র সম্বল।

স্টেশনের সামনে যে রাস্তাটার খানিকটা রাত্রে দেখা যাচ্ছিল, সেটা বেশি লম্বা নয়। একটু দূরে গিয়ে অপেক্ষাকৃত সরু কিন্তু বেশ ভাল একটা উত্তর-দক্ষিণমুখো সড়কে প'ড়ে আমরা উত্তরমুখো চলতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

ছোট্ট শহর। আমরা যে রাস্তা ধ'রে অগ্রসর হতে লাগলুম, তার দু দিকে কোন কোন জায়গায় ঘন খোলার চালের বসতি। কদাচিৎ দু-একখানা ইটের একতলা কি দোতলা বাড়ি চোখে পড়ল। মধ্যে মধ্যে রাস্তার দু পাশেই চষা মাঠ, মাঝে মাঝে কোন ক্ষেতে ফসলও দেখা যাচ্ছে। চলতে চলতে ছোট্ট

বাজার অর্থাৎ খান-তিন-চার-দোকানওয়ালা একটা জায়গায় এসে একজন মুরুব্বীগোছের লোককে জিজ্ঞাসা করলুম, এ রাস্তা কোথায় গিয়েছে ?

লোকটা গম্ভীরভাবে বললে, গয়াজী।

পরিতোষকে বললুম, ভালই হ'ল, চল্, গয়াতেই যাওয়া যাক।

আরও কয়েক মাইল গিয়ে আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ বাবা, এ রাস্তা কতদূর গিয়েছে ?

লোকটি বললে, বিহারশরীফ তক।

কথাটা শুনে একটু দ'মে গেলুম। কারণ বিহারশরীফ মানুষের নাম, না জায়গার নাম, তা অনেক গবেষণা ক'রেও ঠিক করতে পারলুম না। বিদ্যেদার ওখানে যতটুকু উর্দুজ্ঞান হয়েছিল, তাতে শরীফ কথাটি মানুষের মেজাজের প্রতিই প্রযোজ্য, সেটি যে জায়গার পেছনেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে সে জ্ঞান আমাদের হয় নি, এইজন্যেই বলে—অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী !

আরও কতদূর অগ্রসর হয়ে এক ব্যক্তিকে ওই প্রশ্ন করায় সে বললে, পাটনাশরীফ তক।

এতক্ষণে শরীফ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম, এখান থেকে পাটনাশরীফ কতদূর হবে ?

লোকটি মনে মনে কি হিসাব ক'রে বললে, তা ষাট-সত্তর মিল হবে।

যা হোক, হিসাব ক'রে ঠিক করা গেল যে, এই রাস্তা হয় বিহারশরীফ, আর না হয় পাটনা, আর না হয় গয়া অবধি পৌঁছেছে, রাস্তা শেষ হতে এখনও ষাট-সত্তর মাইল বাকি আছে।

চলতে চলতে শহর গ্রাম পেরিয়ে গেলুম। দু পাশে শস্যক্ষেত্র, তারই মাঝখান দিয়ে সোজা রাস্তা বেয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি মন্থরগতিতে, পথের শেষ কোথায় কে জানে !

ক্রমে মধ্যাহ্নসূর্য পশ্চিমে ঢ'লে পড়ল। বোধ হয় সকাল থেকে দশ-বারো মাইল পথ অতিক্রম করেছি। জুতোর অবস্থা আগে থাকতেই ছিল খারাপ, এতখানি পথ চলার ফলে তারা মুখব্যাদান ক'রে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে, ছেড়ে দে বাবা, কেঁদে বাঁচি। তাদের প্রতি মায়াপরবশ হয়ে জুতো হাতে ক'রে চলতে শুরু করলুম। সেইদিন প্রথম বুঝতে পারলুম যে, খালি পায়ে হাঁটাও অভ্যেস করতে হয়।

সারাদিন পথশ্রমে দেহও বিশ্রাম চাইছিল। সকালবেলা ইষ্টিশানের সেই আধ সের দুধ কখন হজম হয়ে গিয়েছে, ক্ষিধের চোটে মনে হতে লাগল, পেটের মধ্যে যেন দধি-মন্থন চলেছে।

সম্মুখেই রাত্রি, কিন্তু আশ্রয় কোথায় ! পথের দু দিকে মাঠের প্রান্তে, সেই একেবারে দিগন্তে বললেই হয়, সেখানে বোধ হয় গ্রাম আছে, কিন্তু সেই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ পার হবার সাহস নেই। দেখলুম, রাস্তা দিয়ে দু-তিন দল রাখাল পাল পাল গরু নিয়ে চীৎকার ক'রে বেসুরো গান গাইতে গাইতে গেল, কোথায় গেল কে জানে ! চলেছি তো চলেইছি, কিন্তু আর যে পা চলে না !

সূর্য তখন প্রায় ডুবে গেছে, এমন সময় আমরা একটা গ্রামের মতন জায়গায় এসে পৌঁছলুম, অর্থাৎ দু-একটা লোক পথে দেখা গেল, একটা বলদের গাড়িও যেতে দেখলুম।

রাস্তার ধারেই বেশ একটু উঁচু জায়গায় একটা ছোট পুকুর, বাংলা দেশের বড় ডোবার মতন হবে, তার চারদিকে ঘন তালগাছের সারি। একটা গাছ থেকে আর একটার ব্যবধান বোধ হয় দশ হাতও হবে না, কোথাও বা জোড়া জোড়া গাছ একসঙ্গে উঠছে। আমরা পথ ছেড়ে এই উঁচু জায়গাটাতে উঠে একজোড়া তালগাছের তলায় ব'সে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

পুকুরটাতে জল নেই বললেই হয়। তবুও মুখ ধোবার জন্যে পাড় বেয়ে জলের ধারে গিয়ে দেখলুম, অত্যন্ত নোংরা জল। মুখ না ধুয়েই উঠে এসে আবার সেইখানে এসে বসলুম। জীবনে এতখানি পথ কখনও হাঁটি নি। অঙ্গের বেদনায় তালগাছের গুঁড়িতে দেহ এলিয়ে দেওয়া গেল।

ব'সে ব'সে দেখতে লাগলুম, মাথার ওপর দিয়ে দু-তিন দল বক উড়ে গেল। একটু দূরেই রাস্তার দু ধারে দুটো বড় গাছ, তার মধ্যে পাখীদের কচ্‌কচিতে সেই নিস্তব্ধ জায়গাটা যেন ভ'রে উঠল, কিন্তু তা অতি অল্পক্ষণেরই জন্য, তার পরেই সব স্তব্ধ। দূরে পশ্চিমে সূর্য ডুবে গেল। গোধূলির শেষ রশ্মিতে দেখলুম, পরিতোষের চোখ দুটো প্রায় বন্ধ হ'য়ে এসেছে। অন্ধকার একেবারে ঘনিয়ে ওঠবার আগেই বৃক্ষমূলে সে দেহ বিছিয়ে দিলে।

চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল। পরিতোষ ঘুমিয়ে পড়েছে, ব'সে ব'সে আমার ভয় করতে লাগল, এই অন্ধকারে কি সারারাত্রি কাটাতে হবে ! মুখ ধুতে যাবার সময় পুকুর-পাড়ে গোটাকয়েক শুকনো তালের পাতা দেখেছিলুম,

মনে হ'ল, সেগুলো টেনে নিয়ে এসে আগুন ধরালে মন্দ হয় না। কিন্তু কি জানি, সেখানে নামতে সাহস হ'ল না। পরিতোষকে ধাক্কা দিয়ে তোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু অদ্ভুত তার ঘুম! কি কতকগুলো বিড়বিড় ক'রে ব'কে সেই ধূলিশয্যায় পাশ ফিরে শুল।

অন্ধকারে উৎকর্ণ হয়ে ব'সে আছি, মধ্যে-মধ্যে কাছে দূরে কড়কড় সড়সড় আওয়াজ হতে লাগল। দেশ্‌লাই জালিয়ে যতটুকু আলো পাওয়া যায়, তাই দিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করতে লাগলুম—তারপরে শান্তিময়ী নিদ্রা এসে কখন কোলে তুলে নিলে জানতেও পারি-নি।

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলুম—দিদিমণির সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির দেশে গিয়েছি—রাজপুতানার পাহাড়ের কোলে স্বর্গের মতন সেই সুন্দর দেশে। পাহাড়ে হচ্ছে তুষার-বর্ষণ ও সেই সঙ্গে পড়ছে বড় বড় বাঁশের লাঠির মতন মোটা ও লম্বা মালাইয়ের কুল্‌পী। দু হাতে ক'রে সেই কুলপী-বরফ খাচ্ছি, কিন্তু পেট ভরছে না কিছুতেই। দিদিমণি ঘরের ভেতর থেকে চ্যাঁচাচ্ছে—খাবার তৈরি হয়েছে, এবার খেতে এস। কিন্তু খেতে যাওয়াটা যে কেন হচ্ছে না তা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ কিসের একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, পরিতোষের মতন আমিও ধূলিশয্যায় লম্বা হয়ে প'ড়ে আছি। কোন্ দূরে যেন কারা গান গাইছে! তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে আবার পরিতোষকে ধাক্কা দিয়ে তোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে কোন সাড়াই দিলে না।

দেখলুম, মাথার ওপরে একটুখানি চাঁদ উঠছে, রাস্তায় খানিকটা আলো ও খানিকটা অন্ধকার। বড় গাছ দুটোর লম্বা ডালপালার ছায়া পড়েছে রাস্তার ওপরে।

রাস্তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি। মধ্যে-মধ্যে একটা দমকা হাওয়া গাছগুলোর ঝুঁটি ধ'রে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার সেই ঘুমন্ত ছায়ানটীদের মধ্যে সাড়া জাগছে। থেকে-থেকে ওপর দিয়ে নাম-না-জানা রাত-পাখীর দল চীৎকার করতে-করতে উড়ে যাচ্ছে, নিস্তব্ধ নৈশ প্রকৃতির বুকে করাত চালিয়ে দিয়ে। মনের মধ্যে একটার পর একটা চিন্তার ঢেউ উঠছে। রাজকুমারী, চাটুজ্জে, দিদিমণি, বদ্যিনাথ, বাঙাল-মা, বড়কর্তা, বিশুদা, গিরিধারীর মুখ তালগোল পাকাতে-পাকাতে আবার ঘুমিয়ে পড়লুম।

এবারে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম। কিসের একটা বিশ্রী উগ্র গন্ধে ঘুম ভেঙে যেতেই চোখ খুলে দেখি, প্রায় আমার নাকের ডগায় একটা জানোয়ারের মুখ! তার চোখ দুটো পড়ন্ত চাঁদের আলোয় জলজল করছে।

বাপ রে!—ব'লে ধড়মড় ক'রে উঠে বসতেই জন্তুটা ভড়্‌কে চার-পাঁচ হাত পেছনে হ'টে গিয়ে আবার জল্‌জলে চোখ দিয়ে আমায় নিরীক্ষণ করতে লাগল।

শীতের রাত্রিশেষ! সারারাত রাস্তায় শুয়ে স্রেফ কাঁপুনির চোটে মুহুর্মুহু ঘুম ছুটে যাচ্ছিল, হঠাৎ এই নতুন আপদের সম্মুখীন হয়ে দরদর ক'রে কালঘাম ছুটতে আরম্ভ হ'ল। জানোয়ারটা তখনও আমার দিকে তেমনই ভাবে চেয়ে। ভয়ে আমার কথা বন্ধ হয়ে গেলেও চক্ষু সজাগ ছিল। দেখলুম, শেয়ালের মতন চেহারা হ'লেও সেটা শেয়াল নয়, শেয়ালের চাইতে অনেক বড়। ঘাড়ের চারিদিকে ঘন কেশর, মাথার দিকটা উঁচু অর্থাৎ সামনের পা দু-খানা অপেক্ষাকৃত বড় আর ল্যাজের দিকটা নীচু। মিনিটখানেক তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছি, হঠাৎ উঠে মারব দৌড়—এই রকম একটা সঙ্কল্প আঁটছি মনে মনে, এমন সময় খসখস শব্দ হতে পাশের দিকে চেয়ে দেখি, আরও চার-পাঁচটা জানোয়ার নিকটে ও দূরে ঘোরাফেরা করছে। অতগুলোকে একসঙ্গে দেখে আমার মনে হ'ল, নিশ্চয় এ নেকড়ের পাল, কারণ নেকড়েরা যে দলবদ্ধ হয়ে শিকার খুঁজতে বেরোয়, সে কথা ছেলেবেলা থেকে বইয়ে প'ড়ে এসেছি। যাঁহাতক সেই কথা মনে হওয়া আর অমনই সেই উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে নীচে প'ড়েই চীৎকার করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম, পরিতোষ উঠে পড়, আমাদের নেকড়ে বাঘে অ্যাটাক্ করেছে। পরিতোষ, বাঁচতে চাস্ তো এখনও ওঠ্ পরিতোষ, আমি পালাচ্ছি।

আমার ওই রকম চীৎকার শুনে জানোয়ারগুলো একটি ক'রে লাফ মেরে মারলে দৌড় ওদিককার মাঠে, ক্ষীণ চাঁদের আলোতে দেখতে পেলুম, রামদৌড় দৌড়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এমন একটা সাংঘাতিক ফ্যাসাদ থেকে যে এত সহজে উদ্ধার পাব, তা কল্পনাও করতে পারি-নি। জানোয়ারগুলোর পলায়নের ধরন দেখে তৃতীয় পক্ষ হয়তো বুঝতেই পারত না, ভয়টা বেশি পেয়েছিল কে! আমি, না তারা?

যা হোক একেবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবার উঠে পরিতোষের কাছে গেলুম। এতক্ষণে দেখি, সে মুখের কাপড়টা সরিয়ে শুয়ে শুয়েই জুলজুল ক'রে চাইছে।

আমাকে দেখে সে ধীরে-সুস্থে উঠে ধরাধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে, কি রে, ষাঁড়ের মতন চ্যাঁচাচ্ছিলি কেন?

তার সেই নিশ্চিন্ত বে-পরোয়া ভাব দেখে রাগে আমার গা জ্ব'লে উঠল। বললুম, কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমোও, এখুনি যে নেকড়ের পাল এসেছিল, তার খোঁজ রাখ?

পরিতোষ সেই রকম ভাঙা গলায় বললে, এঃ, হেঁটে-হেঁটে তোর মাথাটা একদম গরমে গিয়েছে দেখছি। স্বপ্ন দেখ্‌ছিলি বুঝি?

দেখলুম, তখনও তার চোখ থেকে ঘুমের ঘোর একেবারে কাটে-নি। আমি রেগে সেখান থেকে স'রে একটু দূরে গিয়ে ব'সে রইলুম।

আকাশে চাঁদ ক্রমেই নিষ্প্রভ হতে থাকল। পূর্বদিগন্তে একটু ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিল। দূর থেকে দেখতে লাগলুম, পরিতোষ আবার শুয়ে পড়ল। আরও কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ ক'রে উঠে ধীরে-ধীরে এসে আমার পাশে ব'সে বললে, কি রে, রাগ করলি?

বললুম, না, রাগ করবে কেন? সারারাত কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমোবে, তোমার এই ঘুমের জন্যে কোন্ দিন নেকড়ের পেটে চ'লে যাব, তবুও তোমার ঘুম ভাঙবে না।

পরিতোষ আর কথা না বাড়িয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটবার পর সে বললে, এর আগে নেকড়ে বাঘ কখনও দেখেছিলি?

বললুম, কেন, আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নেকড়ের পাল আছে।

পরিতোষ চুপ ক'রে রইল। ব্যাপারটার ওপরে আরও খানিকটা গুরুত্ব চাপাবার জন্যে বললুম, শুনেছি, এই সব জায়গায় নেকড়ে বাঘের ভারি উপদ্রব।

এতক্ষণে ব্যাপারটি অনুধাবন ক'রে পরিতোষ বাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলে, কতগুলো এসেছিল রে?

সত্যি কথা বলতে কি, কতগুলো যে এসেছিল তা দেখবার মতন মানসিক অবস্থা সে সময় আমার ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, পাঁচ-ছটা জানোয়ার দেখেছিলুম। তবুও অবস্থার গাম্ভীর্য বাড়াবার জন্যে বললুম, সে সময় কি আর গুনে দেখবার মতন মনের অবস্থা ছিল? তবুও দেখে মনে হ'ল, পঞ্চাশ-ষাটটা হবে।

পঞ্চাশ-ষাটটা নেকড়ে বাঘের কথা শুনে পরিতোষ এবার দস্তুরমতন ঘ'মে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপ ক'রে ব'সে ও তারই মধ্যে বেশ এক পক্কড় ঘুম মেরে চাঙ্গা হয়ে পরিতোষ বললে, চল্, ওঠা যাক।

তখন বেশ রোদ উঠে গিয়েছে, রাস্তা দিয়ে দু-চারজন লোক ও একটা গরুর গাড়িও চ'লে যেতে দেখা গেল। আমরা পথে নেমে আবার চলতে শুরু করলুম। পথের শেষ কোথায়!

আধ ঘণ্টা অতীত হতে না হতে বেশ টের পেতে লাগলুম, কালকের মতন মনের উৎসাহ বা শরীরের শক্তি আজ আর নেই। খানিকটা পথ এগিয়ে যাই, আবার রাস্তার ধারে কিছুক্ষণ ক'রে বিশ্রাম করি—এই ভাবে চলতে চলতে প্রায় মাইল আষ্টেক পথ অতিক্রম ক'রে আমরা গ্রাম অথবা সেই রকম একটা কোনও জায়গায় এসে পৌঁছলুম। কিছুদূর এগিয়েই একটা বাজার দেখা গেল। দু-তিনখানা একতলা ইটের আর বাকি সব খোলার বাড়ি। গোটাদুয়েক মুদীর দোকান, একটি মাত্র ময়রার দোকান, খাদ্যের মধ্যে দেখলুম এক তাল গুড়ের জিলিপি প'ড়ে রয়েছে একটা তেলচিটে ময়লা বারকোষের ওপর। জিলিপিগুলোতে বোলতা ও রাজ্যের শ্যামাপোকা লেপটে রয়েছে, অর্থাৎ সেগুলো নিরামিষ কি আমিষ তা বিচার করবার প্রয়োজন হয়। দোকানের প্রায় সামনেই কতকগুলো বলদ ব'সে রোমন্থন ক'রে চলেছে, তারই কিছু দূরে খানকয়েক গরুর গাড়ি। চারদিকে এমন অনেক রকমের তরকারি ও শাক বিক্রি হচ্ছে, যা এর আগে কখনও দেখি নি। ক্রমশ

"মহাস্থবির"

সন্ধ্যায়

জীবনের শেষভাগে গোড়াকার রেশ লাগে
খুঁজে মরি ফেলে-আসা পথ।
হারানো দিনের সুর মন করে ভরপুর
বিপরীত চলে মনোরথ।
করেছি যতেক হেলা খেলেছি যতেক খেলা
অবেলায় মনে পড়ে সব।
শান্ত মোর নদীনীরে ছায়া ঘনাইয়েছে ধীরে
থামিছে দিনের কলরব।

বিরূপাক্ষের চিঠি

'শনিবারের চিঠি'-সম্পাদক বরাবরেষু—

মশাই, আপনাদের কাছে কিছুদিন ধ'রে আমার ঝঞ্ঝাটের বিষয় জানিয়ে তো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখছি! আপনাদের পাঠক-পাঠিকাদের একটু নির্ঝঞ্ঝাটে থাকতে দেবার জন্যে কিছুদিন এখান থেকে সরেছিলুম, কিন্তু ক্রমশ দেখছি, তাঁরা আমাকে নির্ঝঞ্ঝাটে অবস্থিত দেখলে বিশেষ সুখী হন না। ক্রমাগত ঝঞ্ঝাট তৈরি ক'রে ক'রে তাঁরা আমাকে আপনাদের মারফৎ পত্রাঘাত করতে শুরু করেছেন এবং আপনারাও আমাকে তার জবাব দেবার জন্যে অস্থির ক'রে তুলছেন—এ তো আর এক উৎপাত শুরু হ'ল দেখছি!

আপনাদের কি বলুন না, প্রাণে স্ফূর্তি আছে, কাগজ বার করছেন, রস দেশের লোকের ফুরিয়ে এলেও আপনাদের রসতত্ত্ব আলোচনা করতে বাধছে না, পাঁচটা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বে-জায়গায় পা ফেলে পুলিসকোর্টে দুটো মেয়ের বিয়ের টাকা জমানৎ দিয়ে আসছেন, দিব্যি কাটছে! কিন্তু আমার তো আর সে অবস্থা নয়!

একে আমি নিজের সংসারের ঝঞ্ঝাট নিয়ে পাগল হয়ে আছি, আবার আমায় যদি আপনাদের পাঠক-পাঠিকাদের সব উদ্ভট সাহিত্যের ঝঞ্ঝাট নিয়ে মাততে হয়, তা হ'লে তো রাত বারোটার পর ঘুমোবার টাইমটাও কাবার হয়ে গেল! আচ্ছা, আমি কি সাহিত্যিক যে সাহিত্যের সমস্যা মেটাব, না, বাংলা দেশের স্বদেশী নেতা যে সর্ববিষয়ে বাণী বিতরণ ক'রে ঝঞ্ঝাটের হাত এড়াব?

আমি গরিব গেরস্থ লোক, যেদিন সকালে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে পারি সেদিন কিছু আনি, যেদিন পারি না সেদিন কর্পোরেশনের টিন্‌চারআইডিন্-গোলা কলের জল খেয়ে শুয়ে পড়ি, আমার কি এসব পোষায়? অত যদি লিখতে পারতুম, তা হ'লে এই দুর্মূল্যের বাজারে একখানা কাগজও কি আর সুবিধেমত লোককে ধ'রে ক'রে বার করতে পারতুম না? ঠিক পারতুম। ও-দিকে 'ইত্তেহাদ্' এদিকে আমার 'একহাত' বেরিয়ে, দেখতেন, বাংলা দেশে কি কাণ্ডটাই না করতে শুরু করেছে। পারি না ব'লেই—করি না।

এতদিন মনে করুন, হিসেব ক'রে কতখানি কাছা পেছনে কতখানি সামনে ঝুলিয়ে ভদ্রসমাজে চলাফেরা করা উচিত তাই ঠিক করতেই ঝঞ্ঝাট বড় কম পোয়াই নি, সম্প্রতি হিসেব মাফিক রেশনের কাপড় পেয়ে এই উভয়সঙ্কট থেকে মুক্তি পেয়েছি। কারণ যে কোন একদিকে ওটা গুঁজে দিলেই লেঠা চোকে, তা—আমার মত লোকের আবার সাহিত্যে মাথা খেলে?

আপনারা বলবেন, আমাদের খেলছে কি ক'রে? সে তো আগেই বলেছি, আপনারা তো বাস্তব জগতে বাস করেন না, মনোরাজ্যেই আপনাদের অপ্রতিহত আধিপত্য—দেশ ম'রে ভূত হ'লে তবে আপনারা জুতসই গোছের প্রবন্ধ লিখতে পারেন। আমাদের নিয়েই তো আপনাদের খোরাক! অতএব ও-প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল।

কিন্তু আপনাদের সংস্পর্শে এলেও যে রেহাই নেই, এইটে সম্প্রতি মালুম পাচ্ছি। আপনাদের মারফৎ শ্রীহট্ট শ্রীভূমি থেকে শ্রীনন্দিতা সোম যে চিঠিখানি পাঠিয়েছেন তাতে তিনি লিখছেন যে, বাংলায় নামের আগে শ্রী বসানো উচিত কি অনুচিত এই নিয়ে তিনি বিশেষ ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন, এবং আমায় তার একটা হদিশ বাতলে দিতে হবে ব'লে অনুরোধ জানিয়েছেন। আচ্ছা, এখন কি এই সব ঝামেলার সময়?

ইচ্ছে হয় আপনি নামের আগে শ্রী দেবেন, নয় দেবেন না—আপনার খুশি! আর কার কি বলবার এয়েক্তার আছে? ও-কথা ছাড়ুন—এখন নামটাই কোনমতে বজায় রেখে যেতে পারলে বাঁচি, কারণ অবস্থা যা পড়েছে তাতে তো পিতৃপুরুষের নাম পর্যন্ত ভুলে যাওয়ার দাখিল, এখন তার আগে শ্রী দিলে বাহার খুলবে, কি না দিলে বিশ্রী দেখাবে, সেসব কি ভাববার সময় আছে?

অবশ্য এককালে এই নিয়ে সাহিত্যে অনেক মারপিট হয়ে গেছে, তা সে সময়ের কথা ছেড়ে দিন। তখন লোকে খেতে-দেতে পেত আর প্রাণ ভ'রে আবোল-তাবোল লিখত। কালিদাস বাঙালী ছিলেন কি কাবুলী ছিলেন—এই নিয়ে কতদিন কি উৎপাতই না গেছে! দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, নেড়ু চণ্ডীদাসের কেচ্ছা নিয়ে খেড়ু সাহিত্যিকরা কাগজ-কলমের শ্রাদ্ধ করেছেন, কিন্তু এখন তো আর সেদিন নেই! এখন এক চিন্তা—বাঁচি কি ক'রে রে বাবা! এই সময় পূর্বপুরুষদত্ত শ্রীকে নিয়ে টানাটানি না করাই ভাল।

আমাদের তো সবই গেছে, শুধু নামের আগে ওইটুকুই জুলজুল করছে, ওটাকে ছেঁটে আর এমন কি কম্পোজিটারদের মেহনৎ কমবে, বলুন? বরং ছাড়লেই ঝঞ্ঝাট! সে যে কি ঝঞ্ঝাট, তা আমি জানি। আরবারে আমার মেজ ছেলেটা টেস্টে গাড্ড দিলে কেন জানেন? ওই শ্রী বাদ দেওয়ার জন্যে।

মশাই, তার ইস্কুলে অনুবাদ করতে দিলে—রমণী শান্তির সহিত ঝগড়া করিল। সে তাহাকে তাহার বাড়িতে থাকিতে দিল না। যামিনী আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল, কারণ সে তাহাকে আন্তরিক ভালবাসিত।—নাও ঠ্যালা!

তিন ঘণ্টা ধ'রে ছোঁড়াটা শুনলুম এই তিনটি নামের সর্বনাম 'হি' হবে, কি 'শী' হবে তাই পঞ্চাশবার খাতায় লিখে আর কেটে কেটে হিমসিম খেয়ে 'দুত্তোর' ব'লে হল থেকে বেরিয়ে এল। ফলে—নট অ্যালাউড।

আচ্ছা, এ-সব পরীক্ষকের বজ্জাতি নয়? একটা শ্রী লাগিয়ে দিলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত বলতে পারেন? একে তো ফ্যাশানের চোটে আজকাল চোখে দেখেও মেয়ে পুরুষকে ঠাওর করবার জো নেই, তার ওপর নামেও যদি না চেনা যায়, তা হ'লে কি ঝঞ্ঝাট বাধে ভাবুন তো।

বলবেন, রবীন্দ্রনাথ তো শেষবয়েসে আর শ্রী ব্যবহার করতেন না। না, তা করতেন না—শেষবয়েসে মানুষ অনেক কিছুই করে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তো আর সেটা বলা চলে না? তিনি করতেন না, তার কারণ চেনা বামুনের আর পৈতের দরকার ছিল না। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বের কবি। সকলেই তাঁকে আপন ভাবত, তাই তাঁর নামের আগে শ্রী বসবে, কি মিস্টার বসবে, কি ম্যাঁসিয়ে বসবে, তা সব জাতের পক্ষে ঠিক করা সহজ ছিল না ব'লেই তিনি ওটা বাদ দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনার আমার পক্ষে তো আর সে যুক্তি খাটে না?

আমাদের শ্রীযুত আর শ্রীমতীদের নিয়েই একটু সুখে শান্তিতে থাকতে দিন, আর বেশি কায়দায় দরকার নেই। "ও যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে সেই আমাদের ভাল" ব'লে এই প্রথাটাই চালিয়ে যান—অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত এড়াবেন। ইতি

শ্রীবিরূপাক্ষ

নব-পরিচয়

যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সামাজিক পরিচয়টা নেহাত মন্দ ছিল না। বেসরকারী স্কুলের হেডমাস্টার। মাসিক আয় 'আহা' 'উহু' করিবার মত না হইলেও সাধারণ বাঙালীর তুলনায় কম নয়। গাড়ি-বাড়ি করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু সস্তা-গণ্ডার বাজারে ভদ্রতা বজায় রাখিয়া সংসার চালাইয়া আসিয়াছি। বন্ধুবান্ধব, ডাক্তার-দোকানদার, ধোপা-নাপিত, ঝি-চাকর ইত্যাদি সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে যাহাদের সম্পর্ক ও সংসর্গ অপরিহার্য, সকলেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিত। কারণ যুদ্ধের আগে পর্যন্ত সামাজিক স্তর-বিন্যাসের এখানে-সেখানে একটু-আধটু ভাঙা-চোরা ঘটিলেও আসল কাঠামোটা ঠিক ছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রবল আলোড়নে সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। আমরা মধ্যবিত্তেরা, যাহারা এতদিন সমাজদেহের ভারসাম্য বজায় রাখিয়া আসিতেছিলাম, ছিটকাইয়া পড়িলাম। যাহারা উপরে ছিল, তাহারা আরও উপরে উঠিয়া নাগালের বাহিরে চলিয়া গেল। যাহারা নীচে ছিল, তাহারা উপরে উঠিল। আমরা ক্রমে দুঃখ-দৈন্যের ভারে নীচের দিকে নামিতে লাগিলাম। ফলে যাহাদের সঙ্গে প্রতিদিনের পরিচয় ছিল, তাহারা একে একে ছাড়িয়া গেল।

পাড়ার রাঘব সরকার সরকারী কণ্ট্রাক্টার ছিলেন। এঞ্জিনীয়ার, ওভারসিয়ার, সরকার ও অফিসের কেরানী, সকলের ক্ষুধা মিটাইয়া বৎসরে যাহা ঘরে তুলিতেন, তাহাতেই শহরে দোতলা বাড়ি তুলিয়াছিলেন, এবং মফস্বলে ছোট-খাটো জমিদারি কিনিয়াছিলেন। পুরাতন একখানি ফোর্ডগাড়িও ছিল তাঁহার। তাহাতে চড়িয়া তাঁহার সালঙ্কারা গৃহিণী ও পুত্র-কন্যারা দামী কাপড়-চোপড় পরিয়া, প্রতিদিন সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইত। মোট কথা, পাড়াতে একজন ধনী ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন তিনি। কিন্তু তাহা হইলেও রাঘববাবু লোক মন্দ ছিলেন না। সকলের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার ছিল তাঁহার। বিশেষ আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও সম্মান করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাজ হইতে ফিরিয়া বৈঠকখানায় বসিতেন। আমি নিয়মিতভাবে সেখানে হাজিরা দিতাম ও চা-সিগারেট খাইতাম। ক্রমে এমনই একটি সম্প্রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল আমাদের মধ্যে যে, কোনদিন না গেলে ডাকিয়া

পাঠাইতেন। আমার অসুখ-বিসুখ হইলে নিজে আসিয়া আমার শয়নকক্ষে আড্ডা জমাইতেন। সময়ে অসময়ে সাহায্যও করিতেন। গৃহিণী স-পুত্র-কন্যা সিনেমা যাইবার বায়না ধরিয়াছেন; টিকিটের মূল্য ও গাড়ি ভাড়া একত্রে খরচটা মারাত্মক; রাঘববাবুকে ঠারে-ঠোরে ব্যাপারটা জানাইতেই তিনি নিজের গাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। রাতদুপুরে গৃহিণীর কলিক-পেন চাড়া দিয়া উঠিয়াছে; রাঘববাবুর দ্বারস্থ হইলাম; তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের সরকারকে ডাক্তার ডাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শোবার ঘরের কড়িকাঠে ঘুণ ধরিয়াছে; অবিলম্বে মেরামত না করাইলে গৃহিণী পুত্রকন্যাসমেত বাপের বাড়ি যাইবেন বলিয়া নোটিস দিয়াছেন; হাতে পয়সার অভাব, অথবা হাঙ্গামা পোহাইবার ইচ্ছার অভাব; রাঘববাবুর শুধু একবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছি; রাঘববাবু তৎক্ষণাৎ অভয়দান করিয়াছেন ও লোকজন পাঠাইয়া মেরামত করাইয়া দিয়াছেন; আমি পরে সুবিধামত খরচ-পত্র দিয়াছি। এমনই ভাবে নানা সময়ে নানা রকমে তাঁহার কাছ হইতে উপকার পাইয়াছি। হঠাৎ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাঘববাবু মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট লইলেন। বৎসর দুইয়ের মধ্যে ফাঁপিয়া ফুলিয়া তরতর করিয়া উপরে উঠিয়া ক্রমে দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া গেলেন। আমাদের শহর আর তাঁহার পছন্দ হইল না। কলিকাতায় বিরাট অট্টালিকা বানাইয়া বসবাস শুরু করিলেন। বৎসরখানেক আগে ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। বাড়ির ফটকে সঙ্গিনধারী দরওয়ান। বুঝাইয়া-শুঝাইয়া, তোষামোদ করিয়া, অনেক কষ্টে ভিতরে ঢুকিলাম। রাঘববাবুর ড্রয়িং-রুমেও ঢুকিবার অনুমতি পাইলাম। সুপরিসর ও সুপরিচ্ছন্ন কক্ষ; কৌচ, কেদারা, সোফা এবং আরও হরেকরকমের আসবাবপত্রে সজ্জিত। রাঘববাবুকে ঘিরিয়া কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া; তাঁহাদের বেশ-ভূষা, হাবভাব দেখিয়া মনে হইল, তাঁহারা কেউ-কেটা নন। রাঘববাবু অনেকটা বদলাইয়াছেন—আরও মোটা হইয়াছেন, কালো রঙ অনেকটা ফিকা হইয়াছে, মাথার সামনে টাক পড়িয়াছে। তবু রাঘববাবু আমাকে চিনিলেন। ফিকা হাসি হাসিয়া কহিলেন, মাস্টার মশায় যে! কখন এলেন? বসুন, সব ভাল তো? আমি জবাব না দিয়া বসিলাম। রাঘববাবু ভদ্রলোকগুলির সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে শুরু করিলেন। আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলাম, আমি এখন উঠি, পরে দেখা

করব। রাঘববাবু অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, যাবেন? আচ্ছা, আসুন। বাহিরে আসিতেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বুঝিলাম, রাঘববাবু শুধু উঠেন নাই, আমিও নামিয়াছি। আমাদের মধ্যে এতটা ব্যবধান যে, রাঘববাবুর সমাজে আমার পরিচয় পর্যন্ত অচল।

অভয় ডাক্তার বহুদিন ধরিয়া আমার বাড়ির ডাক্তার। চাকরি-সূত্রে এখানে আসা অবধি তাঁহার সঙ্গে পরিচয়। তখন তাঁহার তত নামডাক ছিল না। রোজগারও ছিল কম। আমাদের পাড়াতেই একটি ছোট ডিস্পেন্সারি ছিল তাঁহার। সেইখানেই বসিতেন। আমাদের পাড়াতে নামমাত্র ফীতে সকলের চিকিৎসা করিতেন। আমার সঙ্গে ক্রমে তাঁহার বন্ধুত্ব গজাইয়া উঠে। শেষের দিকে আমার বাড়িতে ফী লইতেন না। কিন্তু যে কোন প্রয়োজনে, যে কোন সময়ে ডাকিবামাত্র আসিতেন। এমন কি অনেক সময়ে বিনা প্রয়োজনেও আমার বৈঠকখানায় বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প-গুজব করিয়া যাইতেন। এই সময়ে শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার করালী কর হঠাৎ মারা গেলেন। অভয় ডাক্তারের কর্মক্ষেত্র প্রসার-লাভ করিতে শুরু করিল। শহরের অন্যান্য পাড়া হইতে রোগী আসিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পল্লীগ্রাম হইতেও ডাক আসিতে লাগিল। ব্যবসা-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিবার জন্য অভয় ডাক্তার শহরের মধ্যে ডিস্পেন্সারি তুলিয়া লইয়া গেলেন। তখন আর হামেশা দেখাসাক্ষাৎ হইত না; অবসর হইলে ডিস্পেন্সারিতে গিয়া দেখা করিয়া আসিতাম। তবে কোন প্রয়োজনে ডাক দিলে ডাক্তার নিশ্চয়ই আসিতেন। তারপর যুদ্ধ বাধিল। ঔষধ দুষ্প্রাপ্য হইল। এক টাকা মূল্যের ঔষধ দশ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। তা ছাড়া জমিদার, ব্যবসাদার ও চাষীদের হাতে পয়সা জমিল। ডাক্তাররা মরসুম দেখিয়া তাহাদের ফী চারগুণ বাড়াইয়া দিল। অভয় ডাক্তার বৎসরখানেকের মধ্যেই বাড়ি ও গাড়ি করিলেন। রোগীও জুটিল বিস্তর। ঝকঝকে নূতন গাড়িতে চড়িয়া অভয় ডাক্তার শহর ও মফস্বল চষিয়া ফিরিতে লাগিলেন। এই সময়ে আমার গৃহিণী হঠাৎ রোগে পড়িলেন। পেটে ও পিঠে বেদনা। ঔষধ-পথ্যের দাম ও ডাক্তারদের হাল-চালের কথা ভাবিয়া প্রথমে ডাক্তার ডাকিলাম না। বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শানুসারে মালিশ ও সেক চালাইতে লাগিলাম। কিন্তু কোন কাজ হইল না। শেষে অভয় ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াই স্থির করিলাম। এক রবিবার সকালে ডাক্তারের বাড়ি গেলাম।

নূতন তৈয়ারি দোতলা বাড়ি; সামনে অনেকখানি জায়গা রেলিং দিয়া ঘেরা। দুই পাশে দুইটি গেট। বাড়ির সামনে রাস্তায় মোটর, ঘোড়ার গাড়ি ও রিক্‌শার ভিড়। বাড়ির বারান্দায় অনেক লোক এলোমেলোভাবে বসিয়া ও দাঁড়াইয়া আছে। কোনমতে পথ করিয়া ডাক্তারের বসিবার ঘরে ঢুকিলাম। সেখানেও বিস্তর লোক। যাহারা সুবিধা করিতে পারিয়াছে, বেঞ্চি বা চেয়ারে বসিয়াছে; যাহারা পারে নাই, দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তারের নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই। এক-একজন রোগী সামনে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র ডাক্তার তাহার বুকে-পিঠে এখানে-সেখানে বারকয়েক স্টেথিস্কোপ বসাইতেছেন, পেটের এপাশ-ওপাশ টিপিতেছেন, জিবটা একবার দেখিতেছেন, দরকার হইলে চোখের নীচে আঙুলের চাড় দিয়া এক চোখ দেখিয়া লইতেছেন, সবসুদ্ধ পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি সময় লাগিতেছে না, তারপর খচখচ করিয়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান লিখিয়া টেবিলের উপরেই ছুঁড়িয়া দিতেছেন। রোগী প্রেস্‌ক্রিপ্‌শানটি ভক্তিভরে তুলিয়া লইয়া, ফী চার টাকা গনিয়া দিয়া, কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থম্মন্যতার হাসি হাসিয়া বিদায় লইতেছে। টেবিলে একটা ট্রের উপর টাকা জমিয়া উঠিতেছে।

এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভিড় একটু পাতলা হইলে সহসা ডাক্তার-বাবুর চোখ আমার উপরে পড়িল। হাসিয়া কহিলেন, কি খবর? কতক্ষণ এসেছেন? বসুন।

একটু আগাইয়া গিয়া গৃহিণীর রোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে আরম্ভ করিলাম। ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ শুনিয়াই কহিলেন, বুঝেছি, এক কাজ করুন, ব্লাড আর ইউরিনটা একবার দেখিয়ে রিপোর্টটা কাল আনবেন। আমি প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান ক'রে দেব।

কহিলাম, একবার গিয়ে দেখবেন না?

ডাক্তারবাবু মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন, আজকালের মধ্যে যেতে পারব ব'লে মনে হয় না, তবে— চোখ বুজিয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া, কিছুক্ষণ ভাবিয়া, ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, নাঃ, চার-পাঁচ দিনের মধ্যে সময় হবে না; তবে দেখুন, যাবার দরকার হবে না; রিপোর্টটা দেখলেই সব বুঝতে পারব। ওষুধটা ব্যবহার ক'রেও যদি কোন ফল না হয় তো পরে একবার দেখে এলেই হবে। চুপ করিয়া রহিলাম। ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা, আসুন তা হ'লে। ব্লাড

আর ইউরিনটা আজই দেখিয়ে ফেলুন গে। নমস্কার।—বলিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান একজন রোগীর প্রতি দৃষ্টিসংযোগ করিলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া বিদায় লইলাম।

বারান্দায় রোগীর ভিড়ের মধ্যে কোনমতে পথ করিয়া বাহিরে আসিলাম। গেটের পাশেই গ্যারেজ। ডাক্তারের নূতন-কেনা ঝকঝকে মোটর গ্যারেজ হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লোক—ডাক্তারের কোন চাকর বোধ হয়—কড়া গলায় হাঁক দিয়া কহিল, দাঁড়ান, যাবেন না, গাড়ি বার হচ্ছে। থমকিয়া দাঁড়াইলাম। পিছন ফিরিয়া ডাক্তারের বাড়ির দিকে তাকাইলাম। দোতলার বারান্দায় ডাক্তারের ছেলেমেয়েরা প্রভাতী আড্ডা জমাইয়াছে। পরিপুষ্ট চেহারা, পরিচ্ছন্ন পরিপাটী পরিচ্ছদ। নিজের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বুঝিলাম, ডাক্তারও নাগালের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

বাড়িতে আসিয়া গৃহিণীকে সব পরিচয় দিলাম। গৃহিণী কহিলেন, দরকার নেই ওতে; দশ-বারো টাকার কমে তো ওসব হবে না, কোথায় পাবে এত টাকা? তার চেয়ে বরং সদয়বাবুকে ডাক; পরেশবাবুর গিন্নী বলছিল, বেশ চিকিচ্ছে করে। রামসদয়বাবু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। কেরানীগিরি করনে। যুদ্ধের বাজারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করিয়াছেন। ফী লাগে না; ঔষধের দামও কম। পাড়ার গরিব ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সকলেই তাঁহাকে দিয়াই চিকিৎসা করায়। কেহ বাঁচে, কেহ মরে। কিন্তু বাঁচা-মরা তো ভগবানের হাত, ডাক্তার নিমিত্ত মাত্র। আধ্যাত্মিকতায় আপ্লুত হইয়া উঠিলাম। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া রামসদয়কে ডাকিবার জন্য বাহির হইলাম। ভগবানের কৃপাতেই হোক, বা রামসদয়ের চিকিৎসার গুণেই হোক, গৃহিণী সুস্থ হইয়া উঠিলেন। তারপর হইতে রামসদয়ই আমার বাড়ির চিকিৎসা করিতেছেন। অভয় ডাক্তারকে ডাকিবার স্পর্ধা আর করি নাই।

পরান দে আমার অনেক দিনের পরিচিত দোকানদার। চাল ডাল নুন তেল মসলাপাতি ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় দরকারী জিনিস বরাবর সেই সরবরাহ করিত। বাজারের অন্যান্য দোকানের তুলনায় তাহার দোকানটি ছোটই ছিল। তবে সে নিজেই দোকান চালাইত, এবং লাভের লোভ তাহার বেশি ছিল না। কাজেই জিনিসপত্রের দাম অন্য দোকানের তুলনায় কম হইত। তা ছাড়া খাতির করিত খুব। দোকানে গেলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার

করিত, টিনের চেয়ারটি ঝাড়িয়া বসিতে দিত, এবং পান ও সিগারেট আনাইয়া খাওয়াইত। কোন জিনিস তাহার দোকানে না থাকিলেও অন্য দোকান হইতে আনাইয়া বিনা লাভে সরবরাহ করিত। যুদ্ধের বাজারে চালের কারবারে মোটা লাভ করিয়া পরানের মেজাজ গেল বিগড়াইয়া। দোকানে গেলে আর নমস্কার করিত না, বসিতেও বলিত না, জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বাড়াইয়া বলিত এবং দরকষাকষি করিলে অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া শুনাইয়া দিত জজ-ম্যাজিষ্টরের বাড়িতে এই জিনিস যাচ্ছে, এই দামই দিচ্ছেন তাঁরা; আপনার সুবিধে না হয় তো অন্য দোকানে দেখুন।—বলিয়া অন্য খরিদ্দারের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করিত। পরানের হাব-ভাব দেখিয়া হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতাম কিছুক্ষণ; তারপর সুবিধামত দরের আশায় অন্য দোকানে ছুটিতাম। পরানের মতি-গতি দেখিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার দোকান ছাড়িয়া দিলাম এবং অন্য একটি নেহাত ছোট দোকান হইতে জিনিসপত্র লইতে শুরু করিলাম।

শুধু পরানের নয়, কাপড়ের দোকানদার ভব দত্ত ও স্টেশনারি দোকানদার নিতাই কুণ্ডু, ইহাদের মেজাজও একদম বিগড়াইয়া গেল। আমি যে তাহাদের একদিন বাঁধা খরিদ্দার ছিলাম, সে কথাটা তাহারা যেন ভুলিয়া গেল। দোকানে গিয়া দাঁড়াইলে বসিতে বলা দূরে থাক্, মুখ ফিরাইয়া তাকাইতও না। অনেক ডাকাডাকি করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণের পর কোন জিনিস চাহিলে, হয় 'নাই' বলিয়া বিদায় করিয়া দিত, কিংবা এমন দাম হাঁকিয়া বসিত যে, আর দাঁড়াইতে ইচ্ছা হইত না। অথচ খাতির করার প্রক্রিয়াটা যে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। একদিন নিতাই কুণ্ডুর দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া এক শিশি হর্‌লিক্‌সের জন্য তাহাকে অনুনয়বিনয় করিলাম। নিতাই সেই যে প্রথম হইতেই 'এক ফোঁটা নাই' বলিয়া ঘাড় নাড়িতে শুরু করিল, আধ ঘণ্টা পরেও তার রকমফের হইল না। হঠাৎ একটা জিপ আসিয়া দোকানের সামনে দাঁড়াইল। নিতাই শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া এক লাফে নীচে নামিল এবং ছুটিয়া জিপের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম, গাড়িতে এক ব্যক্তি বসিয়া আছে—শক্ত-পোক্ত চেহারা, ভারী মুখ, মাথায় চকচকে টাক, পরিধানে খাকী প্যাণ্ট ও মিলিটারি কোট। দোকানের একজন ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইনি সাপ্লাই বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

ভদ্রলোক নিতাইকে কি বলিতেই সে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া দোকানে উঠিয়া একেবারে দোকানের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং মিনিট কয়েক পরে দুই হাতে দুইটা শিশি লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ির দিকে ছুটিল। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, হর্‌লিক্‌সের শিশি। অফিসারকে শিশি দুইটি দিয়া নিতাই চরিতার্থতার হাসি হাসিতে লাগিল। অফিসার আরও দুই-চার কথা নিতাইকে বলিয়া চলিয়া গেলেন; নিতাই ভাবমুগ্ধ দৃষ্টিতে ধাবমান গাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিল। আসিতেই কহিলাম, ওঁকে হর্‌লিক্‌স দিলে, অথচ আমাকে—। নিতাইয়ের ভাবাবেশ তখনও কাটে নাই। গম্ভীর মুখে, ভারী গলায় কহিল, ওই দুটি শিশিই ছিল, কোনমতে ওঁর জন্যে রেখেছিলাম। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ঈষৎ উত্তেজনার সহিত কহিল, উনি কে জানেন? সাপ্লাইয়ের বড় সাহেব। ওঁর সঙ্গে— কি যে বলেন তার ঠিক নেই! জবাব না দিয়া চলিয়া আসিলাম। পরে নিতাইয়ের দোকান হইতেই অন্য লোক দিয়া চড়া দামে একশিশি হর্‌লিক্‌স আনাইয়াছিলাম। নিজে আর তাহার দোকানে যাই নাই।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে কাপড়ের দাম চড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভব দত্তর মেজাজও চড়া হইয়া উঠিল। দোকানে গেলে পাত্তাই দিত না। তারপর শুরু হইল কণ্ট্রোল। কেমন করিয়া জানি না, ভব দত্ত কাপড়ের বড় সাহেবের পরম প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠিল। কাপড়ের বড় সাহেব ভাল ভাল ধুতি-শাড়ি বিক্রয়ের অধিকার তাহাকেই দিলেন। ফলে হাকিম-সম্প্রদায়, শহরের ধনী কণ্ট্রাক্টর, ডাক্তার, উকিল ও ব্যবসায়ীরা তাহার খরিদ্দার হইল। কারণ ভাল ধুতি ও শাড়ির 'পার্‌মিট' দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র বড় সাহেবেরই। কিন্তু তাঁহার সম্মুখীন হওয়া আমাদের মত ক্ষীণজীবী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সাধ্য নয়। কাজেই ভব দত্তর দোকানের পাশ মাড়াইবারও উপায় রহিল না আমাদের। ইহা সত্ত্বেও একবার একজন হাকিম-ঘেঁষা বন্ধুর সাহায্যে বড় সাহেবের কাছ হইতে খানকয়েক ভাল ধুতি ও শাড়ির 'পার্‌মিট' সংগ্রহ করিলাম। পার্‌মিটটি পকেটে লইয়া ভব দত্তর দোকানে গেলাম। দোকানে অনেকগুলি সরকারী কর্মচারী বসিয়া ছিল। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া পুলিস কর্মচারী বলিয়া মনে হইল। ভব তাহাদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিল। আমার দিকে দৃক্‌পাতও করিল না। এক পাশে একটা রঙচটা টিনের চেয়ার পড়িয়া

ছিল। তাহাই টানিয়া লইয়া বসিলাম। দোকানের কর্মচারীরা অফিসারদের ধুতি শাড়ি বাঁধাছাঁদা করিতে ব্যস্ত দেখিলাম। অফিসারগুলিকে বিদায় দিয়া ভব দত্ত আমার দিকে তাকাইয়া সবিস্ময়ে কহিল, আপনি? হাসিয়া কহিলাম, হ্যাঁ, আমিই। তা ভাল ধুতি, শাড়ি তোমার দোকানে অনেক আছে শুনলাম, আর শুধু শুনলামই বা কেন, চোখেও দেখলাম, ওই ভদ্রলোকগুলি নিয়ে গেলেন এক-একজন অনেকগুলি ক'রে; আমারও কিছু দরকার; খানকয়েক যদি—। ভব দত্ত বাধা দিয়া গম্ভীর মুখে কহিল, এমনই তো হবে না, পার্‌মিট চাই, বড় সাহেবের পার্‌মিট। মৃদু হাসিয়া কহিলাম, আছে পার্‌মিট, এই যে। বলিয়া পকেট হইতে পার্‌মিটটি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। সে পার্‌মিটটা আদ্যোপান্ত পড়িয়া, মুখ হাঁড়ি করিয়া, ভারী গলায় কহিল, হুঁ, বড় সাহেবেরই বটে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ওঁদের কি! যাকে তাকে পার্‌মিট ঝেড়ে দিচ্ছেন! এদিকে আমি যে কোথা থেকে কাপড় দিই—! কহিলাম, তোমার দোকানে শুনলাম যথেষ্ট কাপড় এসেছে। মুখ ভেংচাইয়া ভবতোষ কহিল, যথেষ্ট কাপড় এসেছে! আপনারা তো সবই শুনছেন! সত্যি কথা ব'লে দিচ্ছি আপনাকে, বিশ্বেস করুন আর নাই করুন, ভাল কাপড় আর একখানিও নেই। যা ছিল সব দিয়ে দিলাম আপনার চোখের সামনে। ঢোক গিলিয়া কহিল, তবে এমনই সাধারণ কাপড় চান তো দিতে পারি এই পার্‌মিটের ওপরেই। কহিলাম, থাক্, দরকার নেই। তা তুমি এক কাজ কর, এই পার্‌মিটের ওপর লিখে দাও যে, কাপড় নেই। ভাবিয়াছিলাম, ভবতোষ ইহাতে কাবু হইয়া উঠিবে; কিন্তু তাহা হইল না। বরং সোৎসাহে কহিল, বেশ তো, লিখে দিচ্ছি। বলিয়া খচখচ করিয়া 'কাপড় আর নাই' লিখিয়া দিল। পার্‌মিটটি আবার পকেটে পুরিয়া দোকানের বাহির হইতেই দেখি ম্যাজিস্টেট সাহেবের চাপরাসি বাইক হইতে নামিতেছে। ভবতোষ এক গাল হাসিয়া আপ্যায়ন করিয়া কহিল, এই যে ভাই খলিল, এস, বস, কি খবর? চাপরাসী দোকানে উঠিয়া গেল। আমি ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া আসিলাম।

বাজারের শেষাশেষি আসিয়া পৌছিয়াছি, এমন সময়ে দেখিলাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চাপরাসী বাইকে চড়িয়া পাশ দিয়া পার হইয়া গেল। পিছনে ক্যারিয়ারে বাঁধা এক মোট কাপড়।

পার্‌মিটটি লইয়া বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। কিন্তু কোন ফল

হইল না। তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, কাপড় আছে জানিয়াই তিনি পার্‌মিট দিয়াছিলেন, কিন্তু কাপড় যদি ফুরাইয়া গিয়া থাকে তো তাঁহার করিবার কিছুই নাই।

সেই দিন হইতে কণ্ট্রোলের বাজারে মিহি কাপড় পরিবার ও গৃহিণী ও ছেলেমেয়েদের পরাইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

কয়লার আড়তদার বগলা নন্দীর ব্যবহারেই বিগলিত হইলাম বেশি। বগলা আমার ভূতপূর্ব ছাত্র। যখন কয়লার ব্যবসা শুরু করে, তখন আমার কাছ হইতে আশ্বাস ও আশীর্বাদ যথেষ্ট পাইয়াছিল। প্রথম হইতেই আমাকে মাসে মাসে আমার আবশ্যকমত কয়লা বাড়িতে পৌছাইয়া দিত। যুদ্ধের সময়ে গাড়ির অভাবে আমদানি কম হইতেই কয়লার দাম চড়িয়া গেল। বগলা নিয়মিতভাবে কয়লা পাঠানো বন্ধ করিল। বারংবার চিঠি লিখিয়া পাঠাইলে বা নিজে গিয়া দেখা করিলে তবে দিত, তাও পুরাপুরি নয়। অন্য আড়তদারদের ধরিয়া ন্যায্য মূল্যের দুই-তিন গুণ বেশি দাম দিয়া বাকি কয়লা সংগ্রহ করিতে হইত। হঠাৎ কয়লাখাদে কুলি-ধর্মঘটের জন্য কয়লার আমদানি দিন কয়েকের জন্য একেবারেই বন্ধ হইয়া গেল। আড়তদাররা রাতারাতি কয়লা আড়ত হইতে সরাইয়া ফেলিল। কয়লার গুঁড়া গোটার চেয়ে বেশি দরে বিক্রয় হইতে লাগিল। আমি বগলার উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া ছিলাম, সবটা না দিক, কিছু তো দিবেই। গৃহিণীর তাড়নায় একদিন বগলার কাছে ছুটিলাম। রেল-স্টেশনের কাছেই কয়লার আড়ত। একটা খড়ের চালার নীচে একটা তক্তাপোশের উপরে উবু হইয়া বসিয়া মুদ্রিতচক্ষে সিগারেট টানিতেছিল বগলা। আশেপাশে কয়লার গুঁড়ার স্তূপ। একটা লোক তাহাই বস্তায় বাঁধিয়া রাখিতেছিল, এবং তাহাই লইবার জন্য জন-কয়েক লোক অনুনয়বিনয় করিতেছিল। বগলা কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া একমনে সিগারেট টানিতেছিল।

ডাক দিতেই বগলা সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়া এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িল, এবং ধূম্রজালের ভিতর দিয়া আমাকে দেখিয়া ধীরে সুস্থে সিগারেটটি নিবাইয়া পাশে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, কি বলছেন?

সোদ্বেগে কহিলাম, আমার কয়লা?

বগলা ধূলিরাশির দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল, ওই তো দেখছেন, ইচ্ছে হয় তো নিয়ে যান।

ব্যাকুল কণ্ঠে কহিলাম, ও যে ধুলো! ওতে রান্না হবে কি ক'রে?

বগলা বেপরোয়াভাবে কহিল, তা আমি কি করব? ও ছাড়া আর নেই। প্রার্থী লোকগুলাকে কহিল, দু টাকা ক'রে মণ, পারবে তো নিয়ে যাও।

তা হ'লে রিক্‌শা ডেকে নিয়ে আসি বাবু।—বলিয়া লোকগুলা শহরের দিকে ছুটিল।

বগলাকে কহিলাম, সত্যি কি কয়লা নেই? বগলা গম্ভীর মুখে কহিল, না।

কহিলাম, কোথায় পাওয়া যায় বলতে পার?

উত্তরে বগলা ডান হাতের পাতা চিত করিয়া দিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম, তোমার বাড়িতে কি কিছুই নেই?

বগলা কহিল, যা আছে তা নিজের জন্যে, আর কিছু এস. ডি. ও. সাহেবের জন্যে; ওঁর কয়লা কিছু বেশি লাগে। সানুনয়ে কহিলাম, আমাকে যদি এক মণ অন্তত—। বগলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না মাস্টার মশায়, পারব না, অনুরোধ করবেন না আমাকে।

চলিয়া আসিলাম। সেই দিন হইতে বগলার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। সম্ভব হইলে একে তাকে ধরিয়া ন্যায্য মূল্যের বেশি দাম দিয়া কয়লা সংগ্রহ করিতে লাগিলাম, না হইলে কাঠ। গৃহিণী চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে রান্না করিতে লাগিলেন।

শুধু ব্যবসাদারদের কাছে নয়, নাপিত ধোপা চাকর ও ঝিদের কাছেও আমার পরিচয় মর্যাদাহীন হইয়া পড়িল।

চারু নাপিত শহরের সেরা নাপিত। হাকিম ও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার একচেটিয়া ব্যবসা। তাহার ছেলে আমার স্কুলের ছাত্র ছিল বলিয়া আমার বাড়িতেও আসিত। তাহার রেট ছিল সাধারণ নাপিতদের চেয়ে বেশি—বড়দের ছয় আনা, ছোটদের চার আনা। গৃহিণী এই নবাবিয়ানার জন্য গঞ্জনা দিতেন। তবু চারুর হাতে ক্ষৌরীকৃত হওয়ার আভিজাত্যের লোভ সামলাইতে পারিতাম না। পাড়ার কালী নাপিত রাস্তার ধারে বসিয়া পাড়ার সাধারণ লোকদের চুল কাটিত। আমাকে দেখিলেই সে আমার মাথার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইত। কিন্তু তাহার হাতে কোনদিন মাথা ছাড়িয়া

দিব, এ আমার উৎকট কল্পনারও অগোচর ছিল। যুদ্ধের বাজারে চারু রেট দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল। গৃহিণী বাঁকিয়া বসিলেন—মাসে মাসে শুধু চুল কাটার জন্য দু টাকা খরচ করা চলিবে না। শেষে একদিন নিজে কালীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ছেলেদের চুল ছাঁটাইয়া দিলেন। আমি কিন্তু চারুর কাছেই চালাইতে লাগিলাম। দিন কয়েক পরে চারু নিজেই আসা বন্ধ করিল। যুদ্ধের মরসুমে শহরে অনেক হালি বড়লোক গজাইয়া উঠিয়াছে; অনেক নূতন-নূতন হাকিমেরও আমদানি হইয়াছে। সকলেই চারুকে চায়। এই নূতন মক্কেলদের ভিড়, তা ছাড়া আমার কাছে পাওনাও নেহাত কম; কাজেই চারু বোধ হয় আসিবার সময় করিতে পারিল না। আমি অগত্যা একদিন কালীকে ডাকিয়া তাহার কবলেই মাথা সঁপিয়া দিলাম।

ধোপার অবস্থাও তথৈবচ। শহরের সেরা ধোপা উপেন বরাবর কাপড় কাচিত। দুধের মত সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিয়া উড়ানি উড়াইয়া স্কুলে যাইতাম। সহকর্মীরা ঈর্ষাকুটিল চক্ষে আমার দিকে তাকাইতেন। পয়সা কিছু বেশি খরচ হইত বটে, তবু এই সামান্য বিলাসটুকু বর্জন করিতে পারিতাম না। যুদ্ধ বাধিতেই ধুতি-শাড়ি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল; বিশেষ করিয়া মিলের ধুতি-শাড়ি। সরকার বাহাদুর আপামরসাধারণের জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়ের ব্যবস্থা করিলেন—মোটা, খাটো, একই রকমের পাড়। ফুড কমিটির কর্তাদের ধরিয়া তাহাই সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। মনিব-চাকর, গিন্নী-ঝি—কোন তফাৎ রহিল না। তবু উপেনের হাতে ধুইয়া আসিলে ওই কাপড়েরই বাহার খুলিত। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। শহরের কাছে মিলিটারি ক্যাম্প বসিল। উপেন সেখানকার কাজে নিযুক্ত হইল। হাকিম বা বড়লোকদের কাপড় না কাচিলেই নয়, তাই কোনমতে কাচিয়া দিত। কিন্তু আমাদের মত লোকদের কাপড়গুলির উপরে তাহার শিক্ষানবিস ছেলেরা হাত পাকাইত। ফলে কাপড় তেমন পরিষ্কার হইত না, ছিঁড়িতও বেশি। গৃহিণী অনুযোগ করিলে উপেনের ছেলেরা স্পষ্ট বলিয়া দিত, স্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় এর বেশি সাদা হবে না। গৃহিণী একদিন বলিলেন, সাদা না হোক, ছিঁড়ছে কেন? ভাড়া খাটাস নাকি? উপেনের ছেলেরা তারপর হইতে কাপড় কাচা বন্ধ করিল। পাড়ায় একজন ধোপা ছিল—কানাই। পাড়ার সাধারণ গৃহস্থদের কাপড় সেই কাচিত। কানাইয়ের কাচা কাপড়ের একটি বিশেষত্ব ছিল।

এমন একটি পাকা ফিকা নীল রঙ ধরিত যে, শত চেষ্টাতে ছাড়িত না। কাজেই ময়লা হইত কম। এত সুবিধা সত্ত্বেও কানাইকে কোনদিন ডাকি নাই। এইবার তাহাকে ডাকিতে হইল। নীলরঙ জামা ও কাপড় পরিয়া সাধারণের সামতল্যে নামিয়া আসিয়াছি—ইহা বিজ্ঞাপিত করিতে করিতে সর্বসমক্ষে চলা-ফিরা করিতে লাগিল।

চাকর ও ঝিদের কাছেও মনিবত্বের মাপকাঠিতে অনেক ছোট হইয়া গেলাম। সংসার-পাতার শুরু হইতেই একজন চাকর ও একজন ঝি বরাবর ছিল। ঝি-চাকরের মাহিনা বেশি ছিল না, কাজেই আয় খুব বেশি না হইলেও কুলাইয়া যাইত। যুদ্ধ শুরু হইতেই ঝি ও চাকর দুইজনেই মাহিনা বাড়াইবার বাহানা ধরিল। আমার মাহিনা না বাড়িলেও তাহাদের দুই-এক টাকা করিয়া বাড়াইয়া দিলাম। দিন কয়েক ঠাণ্ডা রহিল; তারপর আবার টালমাটাল ভাব,—বিশেষ করিয়া চাকরটির। কাজে মন নাই। যেমন-তেমন করিয়া কাজ সারিয়া দেয়; দুপুরে আড্ডা দিতে বাহির হইলে চারটার আগে বাড়ি ফিরে না; গৃহিণী ধমক দিলে মুখের উপর জবাব দেয়। উত্তরদায়ক ভৃত্য না রাখাই শাস্ত্রীয় বিধি। গোপনে চাকর খোঁজ করিবার চেষ্টা করিলাম। দেখিলাম, চাকর দুষ্প্রাপ্য। কেহ আর সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে চাকরি করিতে প্রস্তুত নয়। সরকার বাহাদুর পাঁচ-সাত রকমের নূতন আপিস খুলিয়াছেন। সকলেই সরকারী আপিসে পিয়নের কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত। দোষও তাহাদের দেওয়া যায় না। যুদ্ধের বাজারে সব জিনিসই এত দুর্মূল্য যে, পূর্বের আয়ে সংসার চালানো দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে সবারই। সরকারী আপিসের পিয়নদের মাহিনা বেশি না হইলেও মাগগি ভাতা আছে—বকশিশ আছে। সব মিলাইয়া এক-একজন প্রায় চল্লিশ টাকা রোজগার করে। অবস্থা দেখিয়া গৃহিণীকেই মেজাজের রাশ টানিবার জন্য উপদেশ দিলাম। চাকরটি নিজের মর্জিমত কাজ করিতে লাগিল, গৃহিণী আমার উপদেশমত মুখ বুজিয়া রহিলেন। এমনই করিয়া দিন কয়েক চলিল। একদিন স্কুল হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, চাকরটা মাটিতে লুটাইয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিতেছে, এবং গৃহিণী তাহার কাছে বসিয়া সান্ত্বনা দিতেছেন। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিতেই চাকরটা উঠিয়া বসিয়া হাপুস-নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে জড়াইয়া-জড়াইয়া যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম, তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে।

চিঠি আসিয়াছে কি না প্রশ্ন করিতেই, চাকরটা কান্না থামাইয়া কহিল, চিঠি কে লিখবে বাবু? নেকাপড়া জানে কি কেউ?

তবে খবর পেলি কি ক'রে?

বাজারে আমাদের গাঁয়ের একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল, তার মুখেই শুনলুম। আবার হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিতে লাগিল, কি করব বাবু? বাড়িতে আর মরদ বলতে কেউ নাই। এখুনি যেতে হবেক আমাকে। ছাদ্দ-ছান্তি সেরে, ঘরের বিলি-ব্যবস্থা ক'রে, আবার আসব।

সাবেক বাকি-বকেয়া সমেত সব মাহিনা উশুল করিয়া লইয়া, শ্রাদ্ধ-শান্তির জন্য দশ টাকা অগ্রিম লইয়া এবং যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া চাকরটি বিদায় লইল। আমরা তাহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় দিন গনিতে লাগিলাম।

দিন কয়েক পরে বাজারের মধ্যে হঠাৎ চাকরটার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। পরিধানে সরকারী আপিসের চাপরাসীর পোশাক, বুকের উপর তকমা। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া চট করিয়া পাশের একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িল। তারপর, চাকর আর জুটাইতে পারিলাম না। নিজে ও গৃহিণী মিলিয়া, অর্থাৎ গৃহিণীই প্রায় সবটা, আমি সময়ে অসময়ে কতকটা, সংসারের কাজ চালাইতে লাগিলাম।

ঝিটাকে ভাঙাইল সরকার নহে, সরকারের শত্রু জাপান। কলিকাতায় হঠাৎ গোটাকয়েক বোমা ফেলিয়া দিল। কলিকাতাবাসীরা ঘরবাড়ি ছাড়িয়া মুক্তকচ্ছ হইয়া দিগ্‌বিদিকে পলাইল। প্রত্যেক শহরে কলিকাতাবাসীদের জোয়ার আসিল। বাড়িভাড়া চড়চড় করিয়া বাড়িয়া গেল। ভাঙা প'ড়ো ঘরেও লোকে মোটা ভাড়া দিয়া মাথা গুঁজিয়া থাকিতে লাগিল। এই সময়ে আমাদের পাড়াতে এক ভদ্রলোক আসিলেন। মস্ত বড়লোক। কলিকাতায় বিরাট ব্যবসা। পাড়ায় সোরগোল পড়িয়া গেল। কলিকাতাবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, হাব-ভাব দেখিয়া তাক লাগিয়া গেল সবার। ভদ্রলোকের মস্তবড় পরিবার। ঝি বেশি সঙ্গে আনিতে পারেন নাই। এখানে আসিয়া ঝিয়ের খোঁজ করিতে লাগিলেন। এক যা মাহিনা দিতে চাহিলেন, তাহাতে সকল বাড়ির ঝিরাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঝিয়ের বয়স কিছু কাঁচা ছিল, চেহারাও নেহাত মন্দ ছিল না

তাহাকেই পছন্দ হইল ভদ্রলোকের। ঝিটি বিনা নোটিসে কাজ ছাড়িয়া দিল। তখন হইতে ঝিয়ের কাজও গৃহিণীর ঘাড়ে পড়িল। আর ঝি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কারণ চাকরের মত ঝিও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহাদের বয়স অল্প, তাহাদের কাজ করিবার দরকার নাই; জানি, বড়লোকদের কৃপায় তাহাদের মাসিক বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। পড়তি বয়সের মেয়েদের অবশ্য কাজ করা ছাড়া উপায় নাই; কিন্তু এমন বেতন হাঁকে যে, আমার মত লোকের ছেলেমেয়ের পেট না কাটিয়া দেওয়া চলে না।

এমনই করিয়া দিন দিন ক্রমে ক্রমে সমাজ-সোপানের নীচের ধাপে নামিয়া আসিলাম। আহার-বিহারে, বেশ-ভূষায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালীতে সাধারণের সমপংক্তি হইয়া উঠিলাম। অর্থ ও পদমর্যাদার সামনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির মর্যাদা বাতিল হইয়া গেল। চোখ-কান বুজিয়া কোনমতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ চাকা ঘুরিয়া গেল। আমার এক শ্যালক শহরের সাপ্লাই আপিসের বড় সাহেব হইয়া আসিল। আসিবার আগে আমাকে একটি বাড়ির জন্য লিখিল। আমাদের পাড়ায় একটি ভাল বাড়ি খালি হইয়াছিল; সেইটি ঠিক করিয়া দিলাম। যথাসময়ে শ্যালক সপরিবারে আসিল ও ওই বাড়িতে অধিষ্ঠিত হইল। আমি ও আমার গৃহিণী দুইজনে সব গুছাইয়া দিলাম।

রাঘববাবুর চিঠি আসিল। অতি সৌহার্দ্যপূর্ণ চিঠি। সপরিবারে কেমন আছি—জানিবার জন্য দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরিশেষে জানাইয়াছেন, ব্যবসা সম্পর্কে সাপ্লাই অফিসারের সঙ্গে দেখা করা তাঁহার বিশেষ দরকার। ইহার জন্য তাঁহাকে নিজেই আসিতে হইত। কিন্তু আমি যেহেতু এখানে রহিয়াছি এবং সাপ্লাই অফিসার যেহেতু আমার শ্যালক, সেইজন্য আসিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আমি যেন তাঁহার হইয়া সাপ্লাই অফিসারকে বলিয়া কাজটি করিয়া দিই।

অভয় ডাক্তারের মেয়ের বিবাহ। কাপড়, চিনি ও আটা চাই। একদিন হঠাৎ আমার বাড়িতে পদার্পণ করিলেন। গৃহিণী কেমন আছেন জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল বলিয়া বোধ হইল তাঁহাকে। আমি যে তাঁহার কাছে যাই নাই, সেইজন্য অভিমান ও অনুযোগ করিলেন। সর্বশেষে আসল কথাটি প্রকাশ করিলেন।

শ্যালকের জিপে চড়িয়া নিতাই ও ভব'র দোকানে একদিন গেলাম। আমাকে সাপ্লাই অফিসারের গাড়িতে দেখিয়া দুইজনেই কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। তারপর সাপ্লাই অফিসারের সঙ্গে আমার সম্পর্কের পরিচয় পাইয়া ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া নমস্কার করিল। নিতাই নিজে হইতে কহিল, হরলিক্স কয়েক বোতল এসেছে, চাই নাকি? আমি মনে মনে হাসিয়া কহিলাম, দরকার হ'লে নেব।

অনেক দিন দোকানে পায়ের ধুলো দেন নি— বলিয়া নিতাই আকুল চক্ষে আমার দিকে চাহিল। নিয়মিতভাবে পায়ের ধূলা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহাকে নিশ্চিন্ত করিলাম। ভব দত্ত আমাকে আড়ালে ডাকিয়া আন্তরিক অন্তরঙ্গতার সহিত কহিল, অনেক ভাল ভাল ধুতি-শাড়ি এসেছে দোকানে, চাই তো একটা পারমিট—। বলিয়া কথাটা শেষ করিল না, শ্যালকের দিকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া বক্তব্য প্রকাশ করিল।

আচ্ছা হবে এখন।—বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলাম।

হঠাৎ একদিন সকালে কয়লার আড়তদার বগলা নন্দী বাড়িতে আসিয়া হাজির। একেবারে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইল। কহিলাম, কি খবর বগলা? কয়লা এসেছে নাকি? বগলা সাগ্রহে কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ক মণ চাই বলুন, কালই পাঠিয়ে দেব। কহিলাম, বেশ, টাকাটা দিয়ে দিই তা হ'লে, কেমন? বগলা শশব্যস্তে কহিল, টাকার জন্যে তাড়া কি? আগে পাঠিয়ে দিই, পরে দেবেন এখন।

বগলা বিপদে পড়িয়াছে। কাহাকে কালো দরে কয়লা বিক্রয় করিয়াছে। কালো কয়লার অবশ্য কালো দরেই বিক্রয় হওয়া উচিত। কিন্তু সাপ্লাই অফিসার অত্যন্ত বেয়াড়া-বুদ্ধির লোক; যুক্তিটা মাথায় ঢুকে নাই। ফলে, বগলার লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিয়াছে। বগলা যুক্তহস্তে অশ্রুপূরিত নয়নে কহিল, দয়া ক'রে একটা ব্যবস্থা করুন মাস্টার মশায়। এ বাজারে ব্যবসাটি গেলে ছেলেপিলে নিয়ে পথে দাঁড়াব

চুপ করিয়া সব শুনিয়া যথাবিধি ব্যবস্থা করিবার আশা ও আশ্বাস দিয়া তাহাকে বিদায় করিলাম। যাইবার সময়ে আর একবার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া গেল বগলা।

উপেন ধোপা তো সাপ্লাই অফিসারের বাড়িতে আমাকে দেখিয়া অবাক।

কোন রকমে সামলাইয়া কহিল, হুজুর, আপনি এখানে? হাসিয়া কহিলাম, সাহেব যে আমার শালা। তা তোমার মিলিটারির কাজ কেমন চলছে? উপেন হাত জোড় করিয়া কহিল, সে গেছে আজ্ঞে। তা আপনকার কাপড়চোপড় এখন যাচ্ছে কোথা? কহিলাম, পাড়ার ধোপার কাছেই দিচ্ছি। কি আর করব বল? তুমি তো আর কাচলে না। উপেন হঠাৎ আমার পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, ও কথা যেতে দেন আজ্ঞে। নেহাত বেজে প'ড়ে গিছলাম, না হ'লে আপনাদের মত খদ্দের আবার ছাড়ি! তা গিন্নীমা কি এখানে, না বাড়িতে? কাপড়গুলো তা হ'লে আজকেই—। কহিলাম, এবার থাক্। কাপড় ফিরে আসুক। পরের বার নেবে এখন।

চারু নাপিতও আবার আসিতে শুরু করিয়াছে।

আমার পুরাতন চাকরটি একদিন আসিয়া আমাকে ও গৃহিণীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জুট আপিসে চাকরি করিতেছিল, মাস কয়েক আগে চাকরিটি গিয়াছে। কহিলাম, চাকরি-বাকরি করবি? সে দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, গেরস্থ বাড়িতে চাকরি করতে আর মন সরছে নাই, বাবু। শুনলম, মামাবাবুর আপিসে পিয়নের চাকরি খালি আছে। আপনি একটু ব'লে দিলেই হয়ে যায়। কিরপা ক'রে এইটি ক'রে দেন এজ্ঞে! ছেলে-পিলে নিয়ে বড় কষ্ট! আপনার চাকরের ভাবনা হবেক নাই যতদিন আমি আছি। আমার ছোট ভাইটা বেশ বড়সড় হইছে তাকেই গতিয়ে দিব আপনকার কাছে।

তাহার চাকরি করিয়া দিলাম। পরিবর্তে সে আমার ভৃত্যসমস্যা সমাধান করিয়া দিল।

ঝিয়ের সমস্যা সমাধান করিল পরান। আবার অত্যন্ত ভক্তি করিতে শুরু করিয়াছে। শ্যালকের ও আমার—এই দুই বাড়িতেই ডাল তেল নুন ইত্যাদি সরবরাহ করিতেছে। আমার পুরাতন ঝিটির কলিকাতার বাবু কলিকাতা চলিয়া যাইবার পর, ভরণপোষণের ভার পরানই লইয়াছিল। শ্যালকের বাড়িতে ঝিয়ের প্রয়োজন হওয়ায় তাহাকেই সেখানে বহাল করিয়া দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও একটি ঝি সংগ্রহ করিয়া দিল।

সমাজ-সোপানের আগেকার ধাপ ছাড়াইয়াও উপরে উঠিয়া আসিয়াছি। সংসারযাত্রা অনেকটা সুগম হইয়াছে। তবে পরিচয় বদলাইয়াছে। আগে

সকলে বলিত, 'মাস্টার মশায়'; এখন বলে, 'জামাইবাবু'। এমন কি, আমার সহকর্মীরাও নাকি আমার পিছনে আমাকে জামাইবাবু বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে। তবে এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, যাহারা আমার পূর্ব-পরিচয়ের মূল্য দিতে একদিন কার্পণ্য করিয়াছিল, তাহারাই আমার নব পরিচয়ের মূল্য কড়ায় গণ্ডায় মিটাইয়া দিতেছে।

শ্রীঅমলা দেবী

পদচিহ্ন

কুড়ি

স্বামীর শিয়রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিলেন কাশীর বউ। রাধাকান্ত চোখ বুজে শুয়ে আছেন। বৈঠকখানায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। স্বর্ণবাবু চীৎকার ক'রে উঠলেন, কেষ্ট কেষ্ট! জল,—জল আন। রাধাকান্তদা অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেছেন। কেষ্ট জল নিয়ে ছুটে গেল। মাথায় মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে অল্প শুশ্রূষাতেই তাঁর চেতনা ফিরল বটে, কিন্তু থরথর ক'রে তিনি কাঁপছিলেন তখনও। অ্যালোপাথি মতে চিকিৎসক কয়েকজন এখানে আছে। তাদের মধ্যে একজন কেবল পাস-করা ডাক্তার। বাকি সকলেই হাতুড়ে। পাস-করা ডাক্তারটি নবগ্রামে এসে প্রথমে রাধাকান্তের বৈঠকখানাতেই, আশ্রয় না হোক, আস্তানা নিয়েছিলেন। কিছুদিন তাঁর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়াও করেছিলেন। লোকটি সরলপ্রকৃতির, একটু উচ্ছ্বসিত ধরনের মানুষ। সামান্য কৌতুকেই প্রচুর হাসেন, হাসিরও একটি অদ্ভুত ভঙ্গী আছে—'এ' শব্দে প্রথমে একটি সুদীর্ঘ টান দিয়ে খি-খি-খি-খি ক'রে হেসেই চলেন, হেসেই চলেন। রাধাকান্তকে তিনি শ্রদ্ধাও করেন, ভালও বাসেন। তিনি কিন্তু আজ খবর পেয়েও আসতে পারেন নি সঙ্গে সঙ্গে। গোপীচন্দ্র যে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছেন, যে চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন আজ হতে গিয়েও হতে পারল না, কমিশনার সাহেব রুষ্ট হয়ে রক্তমুখে চাবি ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে গেলেন, সেই চিকিৎসালয়ে তিনি মাসিক তিরিশ টাকা বেতনে ডাক্তার নিযুক্ত হয়েছেন। ডাক্তারখানার দ্বারোদ্ঘাটন না হ'লেও ডাক্তারের উপর ভার পড়েছিল অপ্রত্যাশিত দায়িত্বের। কমিশনার সাহেবের প্রস্তাব, তিনি নতুন নক্শা পাঠিয়ে দেবেন, সেই নক্শা অনুসারে নতুন বাড়ি হবে, এবং গোপীচন্দ্রের

সবিনয় আনুগত্য ও আকুতিপূর্ণ প্রতিশ্রুতির আলোচনার মধ্যে গোপীচন্দ্র, কমিশনার সাহেব ছাড়া ছিলেন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এবং অমরচন্দ্র। সেখানে আর কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। ডাক্তার সেই দরজায় ছিলেন দ্বাররক্ষক। এতে অবশ্য একালের ডাক্তারেরা নিজেদের অপমানিত বোধ করবেন, কিন্তু সেকালের ডাক্তারেরা করতেন না। সেকালের শতকরা নিরেনব্বই জনই করতেন না। বরং ছদ্মবেশী কালপুরুষের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের গোপন আলোচনাকালে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত লক্ষ্মণের মতই নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতেন। এই কারণেই রাধাকান্তর অসুস্থতার সংবাদ পেয়েও তিনি আসতে পারেন নি। হাতুড়ে ডাক্তারদের কাউকে ডাকতে দেন নি কাশীর বউ। রাধাকান্তও বলেছিলেন, না, কাউকে ডাকতে হবে না। আমি সুস্থ হয়েছি।

কাশীর বউ তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে, বিশ্রাম করতে অনুরোধ করেছিলেন। রাধাকান্ত বলেছিলেন, আমায় একবার থানায় যেতে হবে যে।

কাশীর বউ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, না।

'না' নয়। রাধাকান্ত উঠে বসতে চেষ্টা করলেন।

কাশীর বউ আবার বললেন, না। তারা যা করেছে, তার ফল তাদেরই ভোগ করতে হবে—সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। তুমি এই অসুস্থ শরীর নিয়ে উঠতে পাবে না।

স্বর্ণবাবু অপেক্ষা করছিলেন বাইরে—দরদালানে। রাধাকান্ত ও তাঁর স্ত্রীর কথাবার্তা সবই তাঁর কানে আসছিল। তিনি বললেন, আমি যাচ্ছি থানায়। তুমি বিশ্রাম কর রাধাকান্তদা। বউদি ঠিক কথাই বলেছেন।

কাশীর বউ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বেশ স্পষ্ট কণ্ঠেই ঘর থেকে জবাব দিলেন, না।

রাধাকান্ত সবিস্ময়ে তাকালেন কাশীর বউয়ের দিকে, ঘরের ভিতর থেকেও স্বর্ণবাবুর কথার তিনি জবাব দিচ্ছেন বেশ স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে—এটা তাঁকে বিস্মিত করলে। এটা তাঁর কাছে স্ত্রীস্বাধীনতার একটা স্পর্ধিত দৃষ্টান্ত ব'লে মনে হ'ল।

কাশীর বউ কিন্তু 'না' ব'লেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি ব'লেই গেলেন, যাদের ধরেছে, তারা সাধারণ চোর-ডাকাত নয়; সাধারণ চোর-ডাকাতে সাধারণের অনিষ্ট করে, এরা গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে, হয়তো বা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। আর যারা সদর কি কলকাতা থেকে তাদের ধরতে এসেছে, তারাও

আপনাদের পরিচিত পুলিস নয়। তারা গোয়েন্দা-বিভাগের লোক। যে গোয়েন্দারা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র অপরাধ তদন্ত করে, এরা তারাই। তা ছাড়া আপনার যাওয়ার কোন হেতুও নাই। গেলে আপনার অনিষ্ট হতে পারে। আপনি জমিদার; গভর্মেণ্ট এর জন্যে অসন্তুষ্ট হবেন, আপনার উপর কৈফিয়ৎ চাইবেন, আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। যাওয়া তো মিথ্যে হবেই, তার উপর আমার ভাইয়ের জন্যে আপনার অনিষ্ট হোক, এ আমি চাই না। সুস্থ থাকলে ইনি যেতেন—সে যেতেন শুধু ব্যাপারটা জানবার জন্য।

স্বর্ণবাবুও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন কথাগুলি শুনে। তাঁর স্ত্রী অভয়া মুখরা, অত্যন্ত কলহ প্রিয়া, প্রচণ্ড দম্ভ তাঁর। তাঁর রজনীদিদির কথাবার্তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সে কথাবার্তায় মর্যাদার মিষ্ট আবরণের মধ্যে থাকে মর্মান্তিক প্রদাহক জ্বালা, সেও তিনি অনেক শুনেছেন। কিন্তু এই মেয়েটি সরল সহজ ভাষায় যে ভাবে তাঁকে তুচ্ছ ক'রে দিলে, এমন আর কখনও কেউ করে নি তাঁকে। তিনি উত্তর খুঁজে পেলেন না। ক্ষোভের মধ্যে তিনি একটি মাত্র পথ এবং উত্তর পেলেন, তাঁর সামনেই সিঁড়ির দরজাটা খোলা ছিল, সেই দিকে পা বাড়িয়ে তিনি বললেন, তা হ'লে আমি চললাম রাধাকান্তদা।

রাধাকান্ত স্বর্ণের কথার জবাব দিলেন না। দিলেন না নয়, দিতে পারলেন না। তিনি স্তম্ভিতবিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কাশীর বউ যখন প্রথমে স্পষ্ট কণ্ঠে 'না' ব'লে স্বর্ণবাবুর কথার জবাব দিয়েছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল, শহরের মেয়ের শিক্ষাদীক্ষাসম্ভূত স্পর্ধিত স্বভাবের এটা অবশ্যম্ভাবী ফল। স্বর্ণের মত সম্মানিত ব্যক্তির কথার উত্তরে, তিনি উপস্থিত থাকতেও, এ ধারায় সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূর জবাব দেওয়া লজ্জাহীনতার লক্ষণ; শহরের এক শিক্ষকের কন্যার সে সম্ভ্রমজ্ঞান না থাকাই প্রমাণিত করলেন কাশীর বউ এবং পরমাশ্চর্যের কথা এই যে, তাঁর সমক্ষেই সে কথা প্রমাণ করলেন তিনি। কিন্তু পরের কথাগুলি শুনে সে বিস্ময় তাঁর শতগুণ বড় হয়ে উঠল। মনে মনে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, নীরব লজ্জাশীলতার গৌরব ও সে প্রথায় প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত বংশের যে সম্ভ্রম, সে গৌরব এবং সম্ভ্রমকে অতিক্রম ক'রে কাশীর বউ তার চেয়ে বড় গৌরব এবং সম্ভ্রমের অধিকারিণী ব'লে প্রমাণ করলেন, প্রতিষ্ঠিত করলেন। শুধু স্বর্ণ নন, তিনিও নিজেকে যেন ছোট ব'লে মনে করলেন শহরের এই দীপ্তিমতী মেয়েটির কাছে। কটি কথা এখনও তাঁর

কানের কাছে বাজছে।—'এরা গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে, হয়তো বা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে।' দাঙ্গা-হাঙ্গামায় অবলীলাক্রমে মানুষ খুন করতে পারে এখানকার জমিদারেরা, সামাজিক বিরোধেও পারে, সমস্ত সমাজের সঙ্গে বিরোধিতা করতে পারে, সরকারের সঙ্গে স্বত্ববিরোধ নিয়ে মামলা করতে পারে, কিন্তু স্বপ্নেও তারা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কল্পনা করতে পারে না। কাশীর বউ অকম্পিত কণ্ঠে, ম্লান হ'লেও ঈষৎ হাসি হেসেই, কথাগুলি উচ্চারণ ক'রে গেলেন। তাঁর সমস্ত আধ্যাত্মিক বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে যাচাই ক'রেও এই মেয়েটির শিক্ষা এবং দীক্ষাকে অসত্য বা উচ্ছৃঙ্খল মনে করতে পারলেন না। নিন্দার কিছু খুঁজে পেলেন না, শাসন করবার মত ঔদ্ধত্যের সন্ধান পেলেন না। তাঁর মনে হ'ল, আজ তিনি কাশীর বউকে নতুন ক'রে চিনছেন।

কাশীর বউ তাঁর স্থির বিস্মিত দৃষ্টির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন এতক্ষণে, বললেন, আমার উপর রাগ করলে?

রাধাকান্ত ঘাড় নেড়ে জানালেন, না।

কাশীর বউ বললেন, না ব'লে আমার উপায় ছিল না। তারপর কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, কিছু মনে ক'রো না, এখানে ওসব আন্দোলন নাই, এখানকার লোকে ঠিক বুঝতে পারেন না সব। দেশ, স্বাধীনতা—এ সবের কোন ভাবনাই কখনও ভাবেন না, সায়েব-সুবোয় একটু খাতির করলেই হাতে স্বর্গ পান, ইংরেজ-রাজত্বকে অদৃষ্টের বিধান মনে করেন। স্বর্ণ-ঠাকুরপো থানায় গিয়ে রবিকে কিশোরকে হয়তো পীড়াপীড়ি করতেন দোষ কবুল করতে। হয়তো তাদের তিরস্কার করতেন।

রাধাকান্ত বললেন, হ্যাঁ, কথাটা ঠিক, তুমি সত্য বলেছ।

হঠাৎ নীচে জুতোর শব্দে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই চকিত হয়ে উঠলেন। কয়েক-জনেরই জুতোর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে বাড়ির উঠানে; প্রথামত কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ক'রে নিয়ে সাড়াও দিলেন আগন্তুকেরা। মুশকিলের কথা, চাকর কেষ্টও বাড়িতে নাই, সে গিয়েছে কবিরাজ মাখন দত্তের কাছে। ডাক্তারকে না পেয়ে কাশীর বউ কেষ্টকে পাঠিয়েছেন কবিরাজের সন্ধানে। রাধাকান্ত নিজেই উঠতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কাশীর বউ বললেন, না। এ অবস্থায় তোমার ওঠা উচিত নয়।

রাধাকান্ত বললেন, কিন্তু কে এলেন, দেখতে হবে তো!

এখান থেকেই সাড়া দাও। আর যদি কিছু মনে না কর, তবে আমি জানলা থেকে কথা বলতে পারি।

রাধাকান্ত ভাবছিলেন। ঠিক এই সময়েই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, রাধাকান্ত-মামা!

চমকে উঠলেন রাধাকান্ত। গোপীচন্দ্রের কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গেই শিশুকণ্ঠের জবাব শোনা গেল, বাবার অসুখ করেছে। শুয়ে আছেন। গৌরীকান্তর কণ্ঠস্বর। গৌরী বোধ হয় নীচে রয়েছে।

অসুখ! কি প্রকার অসুখ? কি নাম তোমার? হা হা, রাধাকান্তস্য পুত্র, গৌরীকান্ত বুঝি! এই তো সভায় ছিলেন তিনি। এরই মধ্যে কি অসুখ করল?—বংশলোচনের কণ্ঠস্বর।

বাবা অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গিয়েছিলেন।

বলিহারি বলিহারি! তা বলি, ভয়ে নাকি হে? না বাবা শিখিয়ে দিয়েছে ওই কথা বলতে?

না। বাবা শুয়ে আছেন। মা মাথায় বাতাস করছেন।

তুমি মিছে কথা বলছ হে। ডাক তোমার বাবাকে।

গৌরীকান্ত এবার ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে ব'লে উঠল, না। আমি মিথ্যে কথা বলি না। মা বারণ করেছেন। কেন মিথ্যে কথা বলব আমি?

রাবণের বেটা মহিরাবণ, তার বেটা অহিরাবণ—মাতৃগর্ভ থেকে মাটিতে প'ড়েই যুদ্ধ করেছিল। বলিহারি বলিহারি!

চুপ করুন লচুকাকা। ছি, করছেন কি? বালকের সঙ্গে এ কি করছেন?—কণ্ঠস্বর গোপীচন্দ্রের।

রাধাকান্ত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। কাশীর বউ লক্ষ্য ক'রেই খাট থেকে নেমে প'ড়ে বললেন, তুমি উঠো না। আমি দেখছি। ওঁদের কি ডাকব?

রাধাকান্ত বললেন, ডাক। কাশীর বউ বধূ হয়ে কথা বলতে উদ্যত হয়েছেন, এতে তিনি আর আপত্তি করলেন না।

কাশীর বউ জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন, সেখান থেকে অনুচ্চ অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, গৌরীকান্ত, ওঁদের উপরে নিয়ে এস। তাঁর নীচে নামবার শক্তি নাই এখন।

বংশলোচন থেকে গোপীচন্দ্র পর্যন্ত সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, বধূটির এই

ভাবে কথা বলা শুনে। লজ্জাহীনতার জন্য নিন্দা করবার জন্য অন্তর শতমুখী হয়ে উঠেছে সকলের, এই সমাজপ্রচলিত রীতিপদ্ধতি লঙ্ঘন করার ঔদ্ধত্য এবং স্পর্ধাও যেন এর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুচ্ছে আগুনের উত্তাপের মত, অথবা আগুন-ধরা দাহ্যবস্তুর ধূমায়মান অবস্থায় ধোঁয়ার মত, জ্ব'লে উঠে সে আগুন চারিদিকে ছড়াবে—এমন শঙ্কাও মনে উঁকি মারছে সমাজপতিদের। কিন্তু তবু কোথায় রয়েছে সমস্ত কিছুর অন্তরালে অথবা সমস্ত কিছুকে ঢেকে এমন একটা মর্যাদার মহিমা, যাকে নিন্দা করা যায় না, শাসন করা যায় না, শুধু সম্ভ্রম ক'রে মান্য করতে বাধ্য হতে হয়। তার উপর বধূটি যে পরিবারের বধূ, সেই পরিবারের সম্ভ্রম আছে। অন্য কোন সাধারণ পরিবারের বউ হ'লে, যতই মর্যাদা থাক্ না কাশীর বউয়ের কণ্ঠস্বর ও কথা বলার ভঙ্গীতে, তাতে প্রাচীনতম জমিদার-বংশের বংশধর বংশলোচন তাকে শাসন করতে কুণ্ঠিত হতেন না।

কাশীর বউ আবার বললেন, তুমি আগে আগে এস গৌরী, সিঁড়িটা অন্ধকার।

ঠিক এই মুহূর্তেই কেষ্ট চাকর এসে বাড়িতে ঢুকল, তার পিছনে কবিরাজ মাখন দত্ত। দত্তকে দেখে গোপীচন্দ্র চমকে উঠলেন। বংশলোচন ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে চঞ্চল হলেন। রাধাকান্তের অসুখ তা হ'লে সত্য!

দত্ত বললেন, কেমন আছেন এখন?

গোপীচন্দ্র একটু ইতস্তত ক'রেই উত্তর দিলেন, এই আসছি আমরা। তবে বোধ হয় সুস্থই আছেন। কি অসুখ?

আমিও তো এই আসছি। শুনলাম, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। জ্ঞান হয়েছে। সেইটাই সুসংবাদ। নইলে—। মাথা নেড়ে দত্ত বললেন, ওটা খারাপ। অনেক সময়—

বংশলোচন বললেন, বার বার বলি আমি রাধাকান্তকে, ওহে, ভীমের মত মেজাজ নিয়ে যুধিষ্ঠির সাজতে যেও না। ক্রোধকে চেপো না। রাগ চাপতে গিয়েই এমন হয়েছে। বুঝেছ কিনা, এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।

গোপীচন্দ্র বললেন, চলুন চলুন, দেখবেন চলুন। ডাক্তারকেও ডাকলে হয় না। সে তো ওখানে রয়েছে।

কেষ্ট বললে, আজ্ঞে, তাঁকে ডেকেছিলাম প্রথমেই। তিনি আসতে পারেন নি। সায়েবরা রয়েছেন—

মাখন দত্ত বললেন, যাঁরা চিনি খান, তাঁদের চিন্তামণি ভরসা গোপীচন্দ্রবাবু। দীনবন্ধু দীনদরিদ্র নিয়ে ব্যস্ত, তাঁরই বা অবসর কোথায়, আর চিনিখোরদের তাঁকে ডাকলেই বা চলবে কেন? চলুন, দেখি, আমিই দেখি আগে।

গৌরীকান্ত বললে, আসুন।

গোপীচন্দ্র হঠাৎ তাকে কোলে তুলে নিলেন, পরম সমাদর ক'রে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, গৌরীকান্ত, মিথ্যা কথা বলে না, আমি জানি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

* * * *

শেষ রাত্রে বিছানায় উঠে বসলেন রাধাকান্ত। অনুভব করলেন, অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। দত্ত কবিরাজ তাঁকে ঘুমাবার ওষুধ দিয়েছিলেন। কবিরাজ হ'লেও মাখন দত্ত অ্যালোপাথি ওষুধ ব্যবহার ক'রে থাকেন। বংশানুক্রমিক চিকিৎসক তাঁরা। তাঁদের পূর্বপুরুষের আবিষ্কৃত অথবা বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে সংগৃহীত অনেক অব্যর্থ ফলপ্রদ নিজস্ব ওষুধও আছে। নাড়ীজ্ঞান এবং রোগনির্ণয়ে অসাধারণ বোধ। এ সব সত্ত্বেও শহরে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ এবং বিদেশী চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে মাখন দত্ত বাংলা ভাষায় কয়েকখানি অনুবাদ-বই কিনে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা নিজেই শিখেছেন। শহরের ঢেউ নবগ্রামে এসে লাগবেই। এখানকার ভদ্র সম্ভ্রান্ত সমাজ এ অঞ্চলের সর্বাগ্রে শহরের ধারাধরনকে গ্রহণ ক'রে থাকেন। কলকাতায় মেডিকেল কলেজ হয়েছে, স্কুল হয়েছে, সেখানকার পাস-করা ডাক্তারেরা শহর এবং বর্ধিষ্ণু গ্রাম দেখে এসে বসতে আরম্ভ করেছে, কাজেই নবগ্রামে তাঁকে চিকিৎসক হিসাবে বেঁচে থাকতে হ'লে এ শিক্ষা তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে, এ বুদ্ধি তাঁর সহজেই হয়েছিল। রাধাকান্তকে দেখে তাঁকে তিনি ঘুমাবার ওষুধই দিয়েছিলেন—অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ। এবং ঘুম যতক্ষণে আপনি না ভাঙে, ততক্ষণ তাঁকে ডেকে জাগাতে নিষেধ করেছিলেন।

রাধাকান্ত ঘুমিয়েছিলেন ঠিক সন্ধ্যার পরেই। জেগে উঠলেন শেষ রাত্রে। তাঁর খাটের পাশের জানলাটির সম্মুখে আকাশের পশ্চিম প্রান্তে সপ্তর্ষি-মণ্ডল পাক খেয়ে ঘুরে ঝুলে পড়েছে। গ্রামের চারিপাশের গাছপালাগুলির মাথায় ভোরের বাতাস লেগেছে মনে হচ্ছে। মৃদু মর্মর শব্দ জেগেছে যেন। পূর্ব দিকের আকাশ দেখা যায় না এদিক থেকে; ওদিকে এতক্ষণে পূর্বদক্ষিণ কোণে

শুকতারা উঠেছে, পলে পলে সে দিগন্ত থেকে আকাশের উপরের দিকে উঠছে। খাটের উপরে কাশীর বউ এবং গৌরীকান্ত প্রগাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। কাশীর বউ অনেকটা রাত্রি পর্যন্ত জেগে ব'সে ছিলেন স্বামীর শিয়রে। তাঁর দিকে চেয়ে রাধাকান্তের মন ব্যথায় ভ'রে উঠল। তাঁর জীবনের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে রাজরাণী হবার যোগ্য এই মেয়েটি শুধু দুঃখই পেলে। বহুবার এ কথা তাঁর মনে হয়েছে। তাঁর ডায়েরির মধ্যে প্রতি মাসে অন্তত একবার ক'রে কোন একটি ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে এই মনোভাবের পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই সেদিন বীরাষ্টমী ব্রত উপলক্ষ্যে কাশীর বউ তাঁর কাছে এক শো টাকা চেয়েছিলেন, তাঁর অভিপ্রায় ছিল, গ্রামের সকল ছেলেদের তিনি খাওয়াবেন এবং ছোট বাঁশের লাঠিতে লোহার ফলা লাগিয়ে প্রত্যেককে এক-একটি বর্শা বা বল্লম দেবেন। রাধাকান্তের কাছে প্রস্তাবটা প্রথমে কেমন অদ্ভুত ঠেকেছিল; এই মেয়েটির অধিকাংশ কাজকর্ম, কথাবার্তা, কল্পনা রাধাকান্তের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়, কিন্তু পরে ভেবে-চিন্তে বুঝে সেগুলি তাঁর কাছে বড় ভাল লাগে। মেয়েটির কল্পনার অভিনবত্ব, দীপ্তিময় তীক্ষ্ণতা তখন নূতন বিস্ময়ে তাঁকে অভিভূত করে। বীরাষ্টমী ব্রতে এই প্রস্তাব প্রথমে রাধাকান্তের কাছে উদ্ভট মনে হ'লেও পরে তাঁর কাছে খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু হাতে টাকা ছিল না, স্ত্রীর সাধ তিনি সেইজন্য পূর্ণ করতে পারেন নাই। সেদিন তিনি ডায়েরিতে লিখেছিলেন, "নিজের অক্ষমতার জন্য সমস্ত জীবনই দুঃখভোগ করিতে হয়। তাহার জন্য দুঃখ নাই। ভাগ্য বিরূপ, কি করিব? কিন্তু কোনমতেই দুঃখকে সম্বরণ করিতে পারি না, লজ্জা অনুভব না করিয়া পারি না যে, বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্রকে আমার দুঃখ ভোগ করিতে বাধ্য করিতেছি। আমার পত্নীর মত সর্বগুণান্বিতা নারী এ অঞ্চলে নাই। সে রাজরাণী হইবার উপযুক্ত। রাজরাণী হইলে তাহার গুণরাজি পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারিত। আমার গৃহে যে কল্যাণ করিতে পারে, সেই কল্যাণ সে সমগ্র রাজ্যের ঘরে আনয়ন করিত। দরিদ্রের ঘরে সোনার প্রদীপ আসিয়া পড়িলে ঘৃত দূরে থাক্ তৈলাভাবেও তাহাতে আলোক প্রজ্বলিত হয় না; সোনার প্রদীপ আক্ষেপ করে না, কিন্তু দরিদ্রের মনোবেদনা কি উপায়ে নিবারিত হইবে? নিবারণ যিনি করিতে পারেন, তাঁহারই চরণ আমার ভরসা। তাঁহাকেই নিবেদন করিতেছি।" পূজার পরই তিনি কলকাতার এক বন্ধুর কাছে পাঁচ

টাকা পাঠিয়ে বিলাতী ঘোড়দৌড়ের লটারির একখানি টিকিট কিনতে লিখেছেন।

আজও সেই কথাই তাঁর মনে জেগে উঠল। মেয়েটির ভাগ্যদোষ এবং ভাগ্যহীনতার মধ্যেও এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য যে, তাঁর সঙ্গে ওর ভাগ্য এবং জীবন জড়িয়ে গিয়েছে। শুধু তাঁরই নয়, নবগ্রামেরও সৌভাগ্য ব'লে তাঁর মনে হ'ল। মেয়েটির সর্বাঙ্গে লেগে কাশীর পুণ্যময় মৃত্তিকা এসে নবগ্রামের মৃত্তিকাকে সমৃদ্ধ করেছে। ওর শানিত শিক্ষার দীপ্তি ও ক্ষুরধারের সংঘর্ষে এখানকার মানুষের মনের লোহার মরচের স্তরে একটা ঘর্ষণ লেগেছে। তিনি নিজে—নিজেই কি তিনি কম দীপ্তি পেয়েছেন কাশীর বউয়ের কাছে?

তাঁর মনে পড়ল এখানকার একটি প্রৌঢ়া স্বৈরিণীর কথা। কাশীর বউকে বিবাহ করবার পূর্ব থেকেই অবশ্য তাঁর মনে নবগ্রামসমাজপ্রচলিত ভোগ-বিলাসের উচ্ছৃঙ্খলতায় বিতৃষ্ণা জন্মেছিল। তিনি নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছিলেন। কাশীর বউকে বিবাহ ক'রে তিনি সত্য বল পেলেন। সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ ক'রে শাস্ত্র নিয়ে পড়লেন। তাতেও প্রেরণা দিয়েছিল কাশীর বউয়ের পড়ার নেশা। তখন ওই স্বৈরিণীটি দেখতে এসেছিল কাশীর বউকে। বলেছিল, দাঁতাল হাতীর পিঠের মাহুতকে দেখতে এসেছি।

তাঁর সম্পদ থাকলে আজ ওই মেয়েটিকে পাশে নিয়ে নবগ্রামের মুখ ফেরাতে পারতেন এই দক্ষিণপাড়ার দিকে। যে মুখ আজ ফিরল ওই পতিত প্রান্তরের দিকে গোপীচন্দ্রের অর্চনায়, সে মুখ এই দিকে ফিরত। কিন্তু সে হ'ল না। পৃথিবীর সেবায় পার্থিব মূলধন নাই তাঁর। তবু তাঁর জীবনে অপার্থিব বস্তুর দিকে অনুরাগ এসেছে। সেও এই এরই কল্যাণে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তিনি চেয়ে রইলেন আকাশের দিকে। ধীরে ধীরে আলো ফুটছে, আকাশের তারা মিলিয়ে আসছে। পাখিরা কলরব ক'রে একবার ডেকে উঠল। আবার ডাকল। মনে মনে তিনি স্তবপাঠ শুরু করলেন। হঠাৎ খাটের উপর শব্দ হতেই পিছন ফিরে দেখলেন, গৌরীকান্ত উঠে ব'সে তাঁর দিকে স্মিতমুখে চেয়ে আছে। রাধাকান্ত সস্নেহে হাসলেন। স্তবপাঠ তিনি ভুলে গেলেন। মনে হ'ল, তাঁর এবং কাশীর বউয়ের মিলিত জীবনধারার থেকে এই নূতন ধারাটি, এ কি নবগ্রামে সার্থকতা লাভ করতে পারবে না? পারবে, নিশ্চয় পারবে।

স্বয়ং গোপীচন্দ্র আজই তাঁর কাছে ব'লে গেছেন সে কথা। স্তব্ধ হয়েই শুয়ে ছিলেন রাধাকান্ত, তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেককে লক্ষ্য করছিলেন। গোপীচন্দ্র কথাটা বলার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিলেন, এ কথা তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ছে। অন্যের চোখ এড়ালেও তাঁর চোখ এড়ায় নাই।

গোপীচন্দ্র কিছু বলবার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতা দেখে সে কথা গোপন ক'রে বললেন, আপনার অসুখ শুনেই এলাম।

বংশলোচন কিছু বলতেই চেয়েছিলেন, তিনি নিরস্ত হতে চান নি, গোপীচন্দ্র ইঙ্গিতে তাঁকে নিষেধ করেছেন—সেও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নাই। তা ছাড়া, তাঁকে দেখতেই যদি এসেছিলেন, তাঁর অসুস্থতার সংবাদই যদি জানতেন, তবে বংশলোচন গৌরীকান্তকে 'বাবার অসুখ, বাবা বলতে শিখিয়ে দিয়েছে নাকি হে?' এ কথাই বা বললেন কেন? বক্তব্য নিশ্চয় কিছু ছিল। এবং সে বক্তব্য অবশ্যই অপ্রিয়, কারণ প্রিয় বক্তব্য হ'লে বলতে বাধা ছিল না। গোপীচন্দ্রের ভাবে ভঙ্গীতে কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক শুষ্কতাও তিনি লক্ষ্য করেছেন। কথাটা যে কি, অনুমান করতে গিয়ে বার বার তাঁর মনে হয়েছে, কথাটা রবিকে নিয়ে নিশ্চয়। রবি তাঁর সম্বন্ধী, তার অপরাধের জন্য সম্ভবত তাঁকেই কিছু বলতে এসেছিলেন। তিনি ছাড়া আর কাকেই বা বলবে লোকে? কিন্তু কি বলতে এসেছিলেন? এমন ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ম অনুসারে তাঁর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি দেখানোই রীতি ও বিধি। অথচ সহানুভূতির সুর তো সমস্ত আলাপের মধ্যে ক্ষীণতম ধ্বনিতেও বেজে উঠল না! আরও একটা কথা মনে পড়ল তাঁর। বংশলোচন ব'লে গেছেন কথাপ্রসঙ্গে: কমিশনার সাহেব গোপীচন্দ্রকে বলেছেন, এখানকার ভালমন্দ সমস্ত কিছুর দায়িত্ব তোমার, গোপীচন্দ্রবাবু। আমরা দায়ী করব তোমাকে। গোপীচন্দ্র বলে, ভাল করবার ভার নিতে পারি, মন্দ কেউ করলে তার দায় আমি পূরব কি ক'রে? আমি বলি, তা পূরতে হবে। রামচন্দ্রের রাজত্বে শূদ্র তপস্যা করেছিল, সেই পাপে ব্রাহ্মণের ছেলের অকালমৃত্যু ঘটল। ব্রাহ্মণ দায়ী করলে রামচন্দ্রকে। রামচন্দ্রকে প্রতিকার করতে শূদ্র তপস্বীকে বধ করতে হয়েছিল। তোমাকেও তাই করতে হবে।

গোপীচন্দ্র বংশলোচনকে নিরস্ত করেছিলেন, না হ'লে বংশলোচন কথাটা বলতেন। কথাগুলি তখন শুনে রাধাকান্তের মনে হয়েছিল, গোপীচন্দ্রের

ম্যানেজারবাবু মনিবের বিজ্ঞাপন ঘোষণা করছেন। কমিশনার সাহেব আজ দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ঘর দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে দাতব্য-চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন নি, রূঢ়ভাবেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, সেই কথাটা ঢাকছেন এমন ধারার বিজ্ঞাপনের চটক দিয়ে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হ'ল, না। কথাটার অর্থ আছে। হয়তো—

শূদ্র তপস্বী ব'লে গেলেন বংশলোচন তাঁকেই। ধারণাটা মুহূর্তে তাঁর মনে সত্য হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভিতরটা যেন ঝিমঝিম ক'রে আবার ঘুরে গেল। তিনি দু হাতে জানলার গরাদে ধ'রে আত্মসম্বরণ করলেন। তিনি ডাকতে যাচ্ছিলেন কাশীর বউকে, কিন্তু তার পূর্বেই কেউ বাড়ির নীচের রাস্তা থেকে তাঁকে ডাকলে, কে দাঁড়িয়ে? রাধাকান্তবাবু?

সামলে নিয়ে তিনি উত্তর দিলেন, কে?

আমি, ডাক্তার। কেমন আছেন? কাল কোন রকমেই আসতে পারলাম না।

ডাক্তার! এই ভোরবেলা কোথায় গিয়েছিলে?

বাবুকে দেখতে।

বাবুকে? ও, গোপীচন্দ্রবাবুকে! সে কি! কি হ'ল তাঁর?

ডায়রিয়া। খুব বেশি রকমই হয়েছে।

ডায়রিয়া?

হ্যাঁ। ব্যাপারটা শক্ত। কাল খাওয়াদাওয়ার অনাচার হয়েছে।

রাধাকান্ত উত্তর দিলেন না। চুপ ক'রে রইলেন। শঙ্করাচার্যের মোহ-মুদ্গরের একটি কলি তাঁর মনে প'ড়ে গিয়েছিল, মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বং। হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বং।

ডাক্তার বললেন, এখন চলি। সকালে আসব। বলব, অনেক কথা আছে। হ্যাঁ, আর একটা কথা ব'লে যাই। গলা চেপে তিনি বললেন, কলকাতার সি. আই. ডি. আজ সকালে আপনার এখানে আসবে। সম্ভবত—

কি?

সম্ভবত বউঠাকরুণের একটা এজাহার নেবেন। একটু সাহস দিয়ে তাঁকে তৈরি ক'রে রাখবেন।

রাধাকান্ত ধীরে ধীরে ব'সে পড়লেন জানলার গরাদে ধ'রে। গৌরীকান্ত

খাট থেকে ঝুলে প'ড়ে নেমে তাঁর কাছে এসে ছোট দুটি হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধ'রে ডাকলে, বাবা! বাবা!

* * *

দিন পনরো পর।

রাধাকান্ত সেই জানলাটির ধারেই ব'সে ছিলেন। সবল বিশাল দেহখানি তাঁর শীর্ণ হয়ে গিয়েছে এই কয়েকদিনের মধ্যেই। আবারও তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন সেদিন ভোরে। কাশীর বউ সম্পর্কে মনকে তিনি যথাসাধ্য উদার ক'রেও, কলকাতার সি.আই.ডি. এসে তাঁর এজাহার নেবে—এ কল্পনা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। কোন রকমে তিনি বেঁচে উঠেছেন বটে, কিন্তু কবিরাজ আশঙ্কা করেন, হয়তো কর্মক্ষম আর হবেন না তিনি। এ ভাঙা শরীর আর সুস্থ হবে না। এ কয়েকদিন বিছানাতেই তিনি আবদ্ধ ছিলেন, আজ উঠে এসে জানলার ধারে বসেছেন। আজ দিনটি নবগ্রামে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দুদিন আগে থেকেই একটা বাদলা নেমেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রিমিঝিমি বৃষ্টি পড়ছে। চৈত্রের শেষ। বসন্তের বাতাস মোড় ফিরিয়ে উত্তর দিক থেকে বইছে, নতুন ক'রে শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে। তবু এরই মধ্যে লোকজনের ভিড়ের আর অন্ত নাই। উৎসুক হয়ে মেয়েরা এসে জমেছে রাধাকান্তের বাড়ির পাশের চণ্ডীমণ্ডপে। পুরুষেরাও আসছে, কিন্তু তাদের বলা হচ্ছে, পুরুষেরা স্কুলডাঙায় যাও।

অসুস্থ গোপীচন্দ্র চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাচ্ছেন। ডায়রিয়ার আক্রমণ থেকে কোন রকমে তিনি বেঁচে উঠলেন, কিন্তু তা থেকে আমাশয় আরম্ভ হয়েছে। সে আমাশয় কোন রকমেই কমছে না। এখানকার চিকিৎসকেরা শঙ্কিত হয়েছেন, নিজেদের চিকিৎসায় রাখতে ভরসা করছেন না। তাই কলকাতায় যাচ্ছেন চিকিৎসার জন্য। ট্রেন রাত্রে, কিন্তু যাত্রার শুভক্ষণ সকালেই সর্বোত্তম ব'লে এখনই যাত্রা ক'রে তিনি ভিতর-বাড়ি থেকে রওনা হয়ে সমস্ত দিনটা বিশ্রাম করবেন তাঁর নিজের কীর্তিভূমি ওই স্কুলডাঙায়। সেখান থেকে রাত্রে ঘোড়ার গাড়িতে যাত্রা করবেন ট্রেন ধরতে। এ যাত্রার মধ্যে চারিদিকে একটা নৈরাশ্য ঘনিয়ে উঠেছে। লোকে দলে দলে তাঁর যাত্রা দেখতে আসছে, যেন তিনি আর ফিরবেন না। তাই রাধাকান্তও আজ এসে বসেছেন এই জানলার ধারে। গোপীচন্দ্র মহাভাগ্যবান, ভগবানের অনুগৃহীত, বহু পুণ্যে

পুণ্যবান ব্যক্তি। মহাপুরুষ বলতেও আপত্তি নাই। এ নবগ্রামের ইতিহাসে তিনি নিঃসন্দেহে মহাপুরুষ। তাঁকে দেখবেন বইকি।

আকাশ মেঘম্লান।

রাধাকান্তের মনে হ'ল, নবগ্রামের ভাগ্যাকাশের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে আকাশে। নীচে মৃদু কলরব উঠছে। সমবেত লোকেরা মৃদু গুঞ্জনে নবগ্রামের হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করছে। তিনি যেদিন যাবেন, সেদিন নবগ্রাম কতখানি বেদনা প্রকাশ করবে, কে জানে? হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল আর এক দিনের কথা। গোপীচন্দ্রের কীর্তিস্তম্ভের সূচনা হয়েছিল সেই দিনটিতেই, কুলীনপাড়ার কৃষ্ণ চাটুজ্জে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে হাসিমুখে মৃত্যুকামনায় কাশীযাত্রা করেছিলেন সেদিন। বর্ষার শেষ ছিল সময়টা। শরতের প্রারম্ভ। শরতের প্রসন্ন রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ছিল। মধ্যে মধ্যে লঘু মেঘ দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু কোন স্থায়ী ছায়ার বিষন্নতায় বিষণ্ণ ক'রে তুলতে পারে নি। মানুষও এসেছিল দলে দলে, গ্রাম গ্রামান্তর থেকে। হিন্দু এসেছিল, মুসলমান এসেছিল। প্রত্যেকেরই মুখে ওই রৌদ্রোজ্জ্বল দিনের প্রসন্নতা ফুটে উঠেছিল। মৃত্যুর মধ্যে যে অভয় অনুভব করেছিলেন কৃষ্ণ চাটুজ্জে, পার্থিব সমস্ত কিছুর নশ্বরতার অতীত অবিনশ্বর মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের যে স্পর্শ পেয়েছিলেন সেকালের সে বৃদ্ধ, তারই প্রতিবিম্ব যেন প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল সকল পটভূমিতে, সকল পাত্রের সর্ব অবয়বে—সেদিনের উদয়কাল থেকে অস্তকাল পর্যন্ত সকল ক্ষণটি পরিব্যাপ্ত ক'রে, জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যের জ্যোতির প্রতিচ্ছটা যেমন তীরবর্তী তরুশীর্ষকে উজ্জ্বলতর উষ্ণতর ক'রে তোলে, তেমনই ভাবে।

রাধাকান্তের একান্ত প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে, তিনি যেন তেমনই প্রসন্ন উজ্জ্বলতার অভয় দীপ্তি মানুষের মুখে ফুটিয়ে তুলে যেতে পারেন। যেতে তাঁকে অচিরেই হবে। সে তিনি যেন অনুভব করছেন।

"যেতে তাঁকে অচিরেই হবে"? ব্যাকরণ-নির্ণয়ে ভুল হয়েছে। তাঁর নিজের মুখেই হাসি ফুটে উঠল। আর ভবিষ্যৎ কাল কেন?—এই কি বর্তমানতার লক্ষণ? মৃত বনস্পতির কাণ্ডটা মানুষ কবে কেটে অগ্নিস্যাৎ করবে, তারই অপেক্ষায় বনস্পতিকে কি বর্তমান বলা যায়?

মনে পড়ল মাখন দত্তের কথা—মরতে আমরাই মরলাম রাধাকান্তবাবু।

গীতায় মোহগ্রস্ত পার্থকে পার্থসারথি বলেছিলেন, ওই যে কুরুসৈন্য, যাদের বধ করতে হবে ব'লে তুমি শোকপরায়ণ হয়েছ, তাদের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, তারা আমা কর্তৃক পূর্ব থেকেই বিগতপ্রাণ হয়ে রয়েছে। তারা মৃত।

কাল তাঁকে, শুধু তাঁকে নয়, এই নবগ্রামের বর্তমানকেই নিঃশেষিতপ্রাণ করেছে তাদের অজ্ঞাতসারে। অরণ্যের মৃত বৃক্ষকাণ্ডগুলি শুধু মৃত্তিকালগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চিত্রকরের আঁকা চিত্রের অরণ্যের মত। মৃত বৃক্ষের মূলজাল শুধু মাটির মধ্যে নবজাতকদের মূল বিস্তারে বাধা দিচ্ছে। কোন কোন গাছে হয়তো দু-চারিটি পাতা এখনও অবশিষ্ট আছে, কিন্তু আর কিছু নাই, বৃদ্ধিও নাই, ফুলও ধরে না, ফল তো দূরের কথা। তারাও কি জীবিত, তাদের ব্যাকরণ-নির্ণয়ে বর্তমান বলা চলে?

নীচে চণ্ডীমণ্ডপে অকস্মাৎ সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। স্তব্ধতার আকস্মিকতায় রাধাকান্তের চিন্তামগ্ন মন চকিত হয়ে উঠল। এই স্তব্ধতাই গোপীচন্দ্রের যাত্রারম্ভের ইঙ্গিত। তাঁকে নিশ্চয় দেখা গেছে। সম্ভবত বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একখানি পাল্কি এসে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়াল। পাল্কির মধ্যে গোপীচন্দ্রের গৌরবর্ণ দীর্ঘ হাতখানি দেখতে পেলেন রাধাকান্ত।

পাল্কি নামানো হ'ল। গোপীচন্দ্র ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন পাল্কি থেকে। কীর্তিচন্দ্র ও ছোট ছেলে পবিত্রের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সকলকে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানালেন। দেবমন্দিরগুলিতে প্রণাম করলেন। পাড়ার মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিলেন এক দিকে, তাঁদের মধ্য থেকে স্বর্ণবাবুর জ্ঞাতিভগ্নী দুর্দান্ত অমূল্যের মা এগিয়ে এসে একটি আশীর্বাদী ফুল তাঁর মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন, শিগগির শিগগির ভাল হয়ে ফিরে আসুন।

গোপীচন্দ্র ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, আশীর্বাদ করুন আপনারা।

আশীর্বাদ করছি অহরহ। শতবার। অসুখ শুনে থেকে দেবদেবীকে ডাকছি, বলছি, ভাল ক'রে দাও মা, ভাল ক'রে দাও বাবা, নবগ্রামের আশা-ভরসা নরগ্রামের কল্পবৃক্ষ আমাদের গোপীচন্দ্র—তাঁকে সুস্থ ক'রে দাও। ইস্কুল করেছ, ডাক্তারখানা করলে, বোর্ডিং করলে, তুমি বেঁচে থাকলে আরও অনেক অনেক হবে, অনেক পাবে নবগ্রাম। নবগ্রাম কেন, সমস্ত অঞ্চলের লোক।

গোপীচন্দ্র ম্লান হেসে বললেন, ইচ্ছে অনেকেই আছে দিদি। সবই ভগবানের ইচ্ছা। ফিরি তো হবে।

ফিরবে বইকি। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রাণ ভ'রে ডাকছে ভগবানকে। তিনি কি শুনবেন না!

গোপীচন্দ্র বললেন, তাঁর ইচ্ছা। তবে যদি না ফিরি, তবু আটকে থাকবে না। ছেলেদের ব'লে গেলাম। যাবার আগে, গ্রামের সকলকে ডেকে, সকলের সামনে তাদের ব'লে যাব।—আমার বাবার নামে টোল হবে, বালিকা-বিদ্যালয় হবে।

রজনী-ঠাকরুণ এবার এগিয়ে এসে বললেন, ওই ব্যবস্থাটি করবেন না দাদা। লেখাপড়ার সঙ্গে শহরের ফ্যাশান এসে ঢুকবে, মেয়েরা দুই মিলিয়ে চতুর্ভুজ হবে। চতুর্ভুজ হ'লে যে কি হয়, সে তো স্বচক্ষে দেখলেন।

রজনী-ঠাকরুণ আঙুল দিয়ে সর্বসমক্ষে দেখিয়ে দিলেন রাধাকান্তের বাড়ি, কারও বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি কাশীর বউয়ের কথা বলছেন। গোপীচন্দ্র ওই নির্দেশে রাধাকান্তের বাড়ির দিকে চাইতেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল রাধাকান্তের উপর।

রাধাকান্ত একটু হাসলেন।

গোপীচন্দ্র বললেন, রাধাকান্তমামা, আমি চিকিৎসার জন্য যাচ্ছি। আশীর্বাদ করুন। যদি—। ম্লান হেসে তিনি থেমে গেলেন। তারপর বললেন, তা হ'লে ছেলেরা রইল, দেখবেন।

রাধাকান্ত গরাদে ধ'রে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, বেঁচে থাকলে দেখব বইকি। তবে, বনের সিংহই দেখে অপর জীবদের, সিংহের পরে সিংহশাবক শিশু হ'লেও তাকে দেখবার যোগ্যতা তাদের থাকে না। ছেলেদের বরং ব'লে যান, যদিই কোন আশঙ্কা হয় মনে, যেন তারা গ্রামবাসীদের দেখে।

গোপীচন্দ্র এ কথার কোন উত্তর দিলেন না।

রাধাকান্ত বললেন, কায়মনোবাক্যে কামনা করছি, আপনি অচিরে সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন।

গোপীচন্দ্র গিয়ে পাল্কিতে চড়লেন। পাল্কি উঠল। দূরে গাজনের ঢাক বাজছে। চৈত্র-সংক্রান্তির আর বিলম্ব নাই। রাধাকান্ত ফিরে এসে বিছানায় বসলেন। হঠাৎ মনে হ'ল, গোপীচন্দ্র পাল্কিতে চেপে গেলেন, ওই গাজনের

ঢাকের বাদ্যসমারোহের মধ্যে, যেন একটা খণ্ড কালের মহেশ্বরের মত। হাতের জপমালা ঘুরিয়ে এখানকার প্রতিটি দিনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। তাঁর সাধনায় তাঁর কীর্তির জটাজাল বেয়ে এই যুগের ধারা নবগ্রামের বুকে সকল পাপ-মোচনের মহিমায় মহিমময়ী গঙ্গার মত প্রবাহিত হয়ে রইল।

কাশীর বউ এসে দাঁড়ালেন।

রাধাকান্ত সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে মৃদুস্বরে বললেন, কিছু বলছ?

মৃদুস্বরেই কাশীর বউ বললেন, ষোড়শী এসেছে। সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কে? ষোড়শী? ষোড়শী?

হ্যাঁ। সেই।

রাধাকান্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন, বললেন, না না।

সেই মুহূর্তেই ষোড়শী ঘরের দোরের মুখে এসে দাঁড়াল। বললে, তাড়িয়ে দিলেও তো আমি যাব না বাবা। আপনি ছাড়া তো আমার এ কাজ হবে না। সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল বিনা অনুমতিতেই। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বললে, ছোঁব না আপনাকে। কিন্তু পায়ের ধুলো নিতে বড় সাধ ছিল।

কাশীর বউ বললেন, ও কিছু টাকা নিয়ে এসেছে। কিশোরদের মকদ্দমায় খরচের জন্যে দিতে এসেছে। টাকাটা তোমার হাতে দিতে চায়।

রাধাকান্ত ষোড়শীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে।

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আমরা স্বাধীন হইব, মুখ-থ্যাতলানো ব্রিটিশ-সর্পের সুনিবিড় লেজ-বন্ধন ওই সময়ে সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িবে। হাতে সময় আর বড় বেশি নাই, মাত্র এক বৎসর চার মাস। আমাদিগকে খুব দ্রুত তালিম লইতে হইবে। স্বামী-শ্বশুরপরিত্যক্তা মাতৃহীনা অনাথা প্রফুল্লকে রাজরাণী দেবী চৌধুরাণী বানাইতে দস্যুনেতা গুরু ভবানী পাঠকের পূরা পাঁচ বৎসরের কঠোর শিক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল; তাহার পর কর্মশিক্ষা অর্থাৎ প্র্যাক্‌টিকাল ট্রেনিং চলিয়াছিল পাঁচ বৎসর। গত পৌণে চার বছর

ধরিয়া আমাদেরও রাজাগিরির তালিম আরম্ভ হইয়াছে। প্রফুল্লের অরণ্য-পরিবেশ ছিল। গত তেতাল্লিশ সাল হইতে আমাদেরও আশেপাশে চতুর্দিকে হিংস্র শ্বাপদসম্প্রদায় যে ভাবে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে, আমাদেরই বা অরণ্যের বাকি কি আছে! আধুনিক দস্যুনেতা ভবানী পাঠকের সম্প্রদায় আমাদিগকে কৃচ্ছ্র শিখাইবার যে "বাধ্যতামূলক" বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাহাতে আমাদের বাদশাহী পুরস্কার আরও ত্বরান্বিত হইবার কথা। সম্ভবত আমাদের দাসত্ব-সংস্কার অধিকতর মজ্জাগত বলিয়া শিক্ষা তেমন দ্রুত ফলবতী হইতেছে না। বিশ্বাস না হয়, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে প্রফুল্লের শিক্ষার কারিকুলাম আজিকার শিক্ষাপদ্ধতির সহিত মিলাইয়া দেখুন। আমরা তুলিয়া দেখাইতেছি।

"প্রথম বৎসর আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচকলা। আর কিছুই না। দ্বিতীয় বৎসরে কেবল নুন লঙ্কা ভাত আর একাদশীতে মাছ। তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হইল, তুমি ছানা, সন্দেশ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, ননী, ফল, মূল, অন্ন, ব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে, প্রফুল্লের নুন লঙ্কা ভাত। দুইজনে একত্র বসিয়া খাইবে।"

আইনত চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের অর্থাৎ আমাদের "উপাদেয় ভোজ্য খাইবার" কথা, কিন্তু আমাদের নুনলঙ্কাভাতই চলিতেছে, ভাতে আবার অর্ধেক কাঁকর। নিশিরা কিন্তু যথানির্দিষ্ট ঘৃত মাখন ছত্রিশ ব্যঞ্জন পাইতেছে।

"পরিধানে প্রথম বৎসরে চারিখানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসরে দুইখানা। তৃতীয় বৎসরে গ্রীষ্মকালে একখানা মোটাগড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়, শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল, অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়।"

তাহাই করিয়া আসিতেছি, কিন্তু চতুর্থ বৎসরের "পাট কাপড়, ঢাকাই কল্কাদার শান্তিপুরে" জুটিতেছে না।

"কেশবিন্যাস সম্বন্ধেও ঐরূপ। প্রথম বৎসরে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ বাঁধিতে হইত। দ্বিতীয় বৎসরে চুল বাঁধাও নিষেধ। দিনরাত্র রুক্ষ চুলের রাশি আলুলায়িত থাকিত। তৃতীয় বৎসরে ভবানীঠাকুরের আদেশ অনুসারে সে মাথা মুড়াইল।"

আমরাও মাথা মুড়াইয়াছি, কিন্তু "ভবানী ঠাকুরের আদেশে কেশ গন্ধতৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়া সর্বদা রঞ্জিত" করিতে পাইতেছি না। "প্রথম বৎসরে তুলার তোষক তুলার বালিশ, দ্বিতীয় বৎসরে বিচালীর বালিশ, বিচালীর

বিছানা, তৃতীয় বৎসরে ভূমিশয্যা।" এখনও ভূমিশয্যাই চলিতেছে, "কোমল দুগ্ধফেননিভশয্যা" জুটিল না।

না জুটুক, তবু আমরা রাজা হইব। চারচিলের অশুভ চীৎকারসত্ত্বেও আমরা রাজা হইব; সমগ্র দেশব্যাপী আমাদের এই বিপুল কৃচ্ছ্রসাধনা কখনই বিফলে যাইবে না। মারেরা ডিস্‌পোজালের এগ-বীফ-হ্যাম-চীজ-বাটার-বিস্কিট লইয়া আমাদিগকে যতই প্রলুব্ধ করুক, এই কয়েক বৎসরের কঠোর শিক্ষার পর আমাদের আর মার নাই।

—

আমাদের দেশে নানাভাবে শিক্ষা-সংস্কার আরম্ভ হইতে চলিয়াছে। সারা ভারতবর্ষে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় সার্জেণ্ট সাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী একটা ওলট-পালট হইবার কথা। বাংলা দেশেও ইসলামিক শিক্ষার জন্য বিপুল বরাদ্দের কথা শুনিতেছি। অদ্যকার (৮.৩.৪৭) সংবাদপত্রে দেখিলাম, গতকল্য রাজসাহীতে বাংলার প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই বৎসরে মুসলিম শিক্ষার জন্য দশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, আগামী বৎসরে উহা বাড়াইয়া পনরো লক্ষ করা হইবে। দেশের অশিক্ষিত অজ্ঞানদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার এই প্রচেষ্টাকে বাংলা দেশের আপামরজনসাধারণ সানন্দে সমর্থন করিবেন; কারণ কোনও শিক্ষাই শেষ পর্যন্ত অনিষ্টকর হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে কঠোর শিক্ষা আমাদের বর্তমান দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামে একান্ত প্রয়োজন তাহার জন্য কোনও বরাদ্দই আমাদের সহৃদয় ও চিন্তাশীল শাসনকর্তারা করেন নাই। সে শিক্ষা ব্যতিরেকে বর্তমান রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থায় আমাদের বাঁচিবার কোনও উপায় নাই, ইহাই হইবে আমাদের সত্যকার প্রাথমিক শিক্ষা এবং নিতান্ত শিশুবয়স হইতেই "বাধ্যতা-মূলক"ভাবে দেশের যাবতীয় ছাত্র-ছাত্রীকে এই শিক্ষা দিতে হইবে। 'বর্ণপরিচয়' 'বোধোদয়ে'র সঙ্গে সঙ্গে আমরা যাহাতে ব্যাপকভাবে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারি, এখন সর্বাগ্রে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে।

যে শিক্ষার কথা আমরা বলিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও আধুনিক, গত পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে নগরবাসী সকলেই এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ব্যক্তিগত অথবা পরিবারগতভাবে প্রত্যেকেই স্ব স্ব বুদ্ধি ও কৌশল অনুযায়ী নিজেদের শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছেন। ফলে কাজ কিছু

অগ্রসর হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষা সর্বত্র নিয়মানুগভাবে এক পদ্ধতিতে না হওয়াতে নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। এখন ইহাকেই নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়া গবর্মেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় একটা নাম বা শিরোনামার গৌরব দিয়া অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিলেই দেশের স্থায়ী উপকার সাধিত হইতে পারে। বিখ্যাত অপরাধ-বৈজ্ঞানিক পঞ্চানন ঘোষাল মারফৎ আমরা অবগত হইয়াছি যে, গাঁটকাটা ও পকেটমাররা তাহাদের বিদ্যাকে এমন সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছে যে, ইহা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলামভুক্ত বিষয় হইতে পারে। রাজাবাজার ও গ্যাঁড়াতলা, বড়বাজার ও জগুবাবুর বাজার আজকাল সর্বত্র একই পন্থা অনুসৃত হইয়া থাকে এবং কুত্রাপি অনধিকারচর্চাজনিত সংঘর্ষ হয় না। সমাজের ক্ষতিকর বিষয়ও যদি শিক্ষার মর্যাদা লাভ করিতে পারে, যাহাতে নিঃসংশয়ে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হইবে, তেমন শিক্ষা নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনার বিষয় হইবে।

আমরা এতক্ষণ ধান ভানিতে শিবের গীত গাহি নাই। ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু পাঠকেরা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষার দিকেই আমরা এতক্ষণ ইঙ্গিত করিতেছিলাম। যেখানে কণ্ট্রোল আছে এবং যেখানে কণ্ট্রোল নাই, উভয় ক্ষেত্রের উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই আমাদের এত ক্লেশ, এত লাঞ্ছনা, এত হেনস্থা। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে ঘুষি ও ঘুষ, হাত ও পায়ের যথাযথ প্রয়োগ শিখিতে হইবে, উপরন্তু হাতসাফাই শিখিতে পারিলে ভাল। ভোরের শীতার্ত আবহাওয়া হইতে মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর উত্তাপ পর্যন্ত থলি বোতল অথবা পারমিট কার্ড হস্তে লাইন দিয়া পথে দাঁড়াইবার অভ্যাস এই শিক্ষার প্রথম পর্ব; মধ্যাহ্ন মধ্যরাত্রির দিকে গড়াইয়া গেলেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলে চলিবে না। ঠেলাঠেলি গুঁতাগুঁতি কনুই-প্রয়োগ এই শিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব; বদজোবান চিমটি ও চাঁটি হজম করিবার শক্তি তৃতীয় পর্বে অর্জনীয়; স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই শিক্ষার পরীক্ষা মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত গড়াইতে পারে। অ্যালজেব্রা-মেড-ঈজির মত ঈজি পথও বুদ্ধিমানেরা অবলম্বন করিতে পারেন, তাহারও শিক্ষা আছে। থলি বা বোতল রাস্তায় আড়াআড়ি বসাইয়া বা শোয়াইয়া শ্যামবাজারের চৌমাথা হইতে কলিকাতা রেসকোর্সে চার ইভেণ্ট রেস খেলিয়া আসিয়া আবার যথারীতি লাইনে দাঁড়াইতেও বিচক্ষণ লোককে দেখা গিয়াছে। ধুতি-শাড়ির কণ্ট্রোল-দোকানে এই শিক্ষার চরম পরীক্ষা। উপরি উপরি ষোলো দিন কিউ-রূপী অজগর সর্পের লেজ হইতে মুখ অবধি পৌঁছিয়াও একজনকে বিফলমনোরথ হইতে

দেখিয়াছি। বারো ঘণ্টা ধস্তাধস্তির পর দোকানীর মুখের "আজ নয়, কাল" উপর্যুপরি পনরো দিন হজম করা চাট্টিখানি কথা নয়। ডিগ্রীর ব্যবস্থা হইলে ইহারাই ডক্টরেট পাইবেন। ওজন-বহনরূপ সহিষ্ণুতার শিক্ষা ইহারই আনুসঙ্গিক, পাঁচ সের হইতে আধ মণ কয়লা বহন করিবার জন্য প্রত্যেককে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

কণ্ট্রোলের শিক্ষা প্রায় এই জাতীয়। যাঁহারা ঘুষের উপাসক তাহাদিগকে ভিন্নভাবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শিখিতে হইবে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ গোপনীয়। চিবাইয়া কাঁকর হজম করা, কাঁইবীচির রুটি খাইয়া প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতির পরস্পর জোড়লাগা নিবারণ করা, অজৈব ঘিয়ের জন্য প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে জৈব রক্ত মোক্ষণ করা, এক শিশি হবুলিক্‌সের জন্য জামাই ও শ্বশুরে গোপন প্রতিযোগিতা—শিক্ষার এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির একীকরণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির জন্য যে বিশ্ববিদ্যালয় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন, সেই সংস্কৃতির ধারক আধুনিক মানুষকে জীবন-যুদ্ধে প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহারা কি আগাইয়া আসিবেন না?

কণ্ট্রোল বিভাগে আমাদের তবু কতকটা অশিক্ষিতপটুত্ব জন্মিয়াছে, কিন্তু কণ্ট্রোল এখনও যেখানে "দ্রংষ্ট্রা করালানি" বিস্তার করিতে পারে নাই, সেখানে অবিলম্বে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়া আবশ্যক। ইহার জন্য প্রত্যেক স্কুলে কলেজে জিমন্যাষ্টিক ও অ্যাক্রোব্যাটিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাসের দরজার হাতল ধরিয়া শূন্যে ঝুলিতে ঝুলিতে অবলীলাক্রমে সাড়ে তিন মাইল পথ অতিক্রম করা, দুই হাতে র‍্যাশনের আধমণী দুইটি থলি লইয়া চিঁড়াচ্যাপ্টা অবস্থায় চলন্ত বাসের উপরে দাঁড়াইয়া ব্যালেন্স রক্ষা শুধু নয়, পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া তাহার মুখ খুলিয়া কণ্ডাক্টারের হাতে আনি ও আধআনি প্রদান, পিছনের বাম্পারের এক 'জ' প্রস্থের উপর আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকা, তিনটা বাঁধাকপি, এক জোড়া জুতা, ছাতা ও লাঠি লইয়া এক ফুট দ্বারপথে এক গ্রোস লোকের ভিড় ঠেলিয়া চলন্ত গাড়িতে চাপা যে রীতিমত শিক্ষা ও অনুশীলন সাপেক্ষ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও গবর্মেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাহা স্বীকার করিবেন। মাধ্যমিক শিক্ষা বিল প্রবর্তনের জন্য এতখানি তোড়-জোড় না করিয়া ইহারা দেশের জনসাধারণের প্রভূততম কল্যাণের মুখ চাহিয়া যদি আমাদের নির্দিষ্ট এই প্রাথমিক শিক্ষা-বিলটি পাস করিয়া দেন, তাহা হইলে ইহাদের জয়জয়কার হইবে। এই শিক্ষা উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইলে যে

সাম্প্রদায়িক সমস্যারও অচিরাৎ সমাধা হইয়া যাইবে, ইহা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি। বে-ইজ্জৎ হইবার শিক্ষা আমরা দীর্ঘ সহস্র বৎসর ধরিয়া লাভ করিয়াছি, এতদিনে পথে-ঘাটে আরোহণ ও অবতরণকালে আমরা এত ঘন ঘন বে-আব্রু হইতেছি যে, মনে হয় ইংরেজ শেষ পর্যন্ত লজ্জাবশেই ইণ্ডিয়া কুইট করিতেছে। একটা সুমহান ও সুপ্রাচীন জাতি যে কতখানি সহ্য করিতে পারে, তাহা সম্পূর্ণ অবগত হইবার পূর্বেই সহ্যশক্তির অভাবেই ইংরেজ বিদায় লইতেছে, সৌভাগ্যের বিষয়, তাহাদিগকে ইলেভেন-এ থ্রি টু-এ অথবা তেত্রিশ নম্বর রুটে বাসযোগে বিদায় লইতে হইবে না।

—

কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ প্রায় বাল্যকালে মাত্র ষোলো বৎসর বয়সে (১২৮৪ বঙ্গাব্দে) মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে যে বিরূপ কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে বারংবার বিবিধ কৈফিয়ৎ দাখিল করিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাদের কাছে তাঁহার বিরূপতার মৌলিক কারণ স্বরূপ গৃহশিক্ষকের একটি আকস্মিক চড়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। 'কবিতা'-সম্রাট বুদ্ধদেব বসু আজ প্রৌঢ় বয়সে রবীন্দ্রনাথের বাল্যের ভুলটারই সাফাই গাহিতেছেন,—মধুসূদনকে গালি গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের চাটুবাদ। যে চড়ে বালক রবীন্দ্রনাথের মানসিক অসুস্থতা ঘটিয়াছিল, প্রৌঢ়ের সুস্থতার জন্য সেরূপ একটি চড়ের প্রয়োজন।

বুদ্ধদেব বসু মধুসূদনের চূড়ান্ত শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, যথা—

"মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, দুর্মরতম কুসংস্কার। তাঁর নাট্যরাজি অপাঠ্য, মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ। তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ পদাবলী বাগাড়ম্বর মাত্র, এমন কি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বীরাঙ্গনা কাব্যেও জীবনের কিঞ্চিৎ লক্ষণ দেখা যায় একমাত্র তারার উক্তিতে। প্রহসন দুটিও কাঁচা হাতের কৃশাঙ্গ নকশা মাত্র, অনেকটাই তার ছেলেমানুষি। মেঘনাদবধ কাব্য বানিয়ে-তোলা জিনিস। সমগ্র কাব্যটি হয়েছে ছাঁচে-ঢালা কলে-তৈরি নির্দোষ নিষ্প্রাণ সামগ্রী; অন্তঃপুরে অনধিকারী; কিঞ্চিদধিক ছয় সহস্র পংক্তির মধ্যে দুটি চারটির বেশি নেই যা প'ড়ে মনে হয় কবি কিছু বলতে চেয়েছিলেন। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে মাইকেলের প্রভাব বলতে গেলে শূন্য, এমন কি মোহিতলালের প্রশংসনীয় উদ্যমসত্ত্বেও তাঁর প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর পর্যন্ত জাদুঘরের মূল্যবান নমুনা হয়েই রইলো; মাইকেলে শুধু আঁকাড়া অনুকরণ; মেঘনাদবধ কাব্য দৃষ্টিহীন গতানুগতির একটি অনবদ্য

উদাহরণ। তিনি ভীরুতায় তাঁর অবজ্ঞাভাজন রামেরই সমকক্ষ, রাম ধর্মভীরু আর তিনি প্রথাভীরু। তাঁর অনুপ্রাস শিশুতোষ, উপমা দ্যুতিহীন, পুনরুক্তি ক্লান্তিকর। শুধু যে বাংলা ভাষার প্রকৃতি বোঝেন নি তা নয়, সাহিত্যের আদর্শ নির্বাচনেও মাইকেল ভুল করেছিলেন। যদিও অনেকগুলি ভাষা শিখেছিলেন এবং পড়েছিলেন বিস্তর, তবু একথা মনে করতে পারি না যে তিনি ঠিকমতো পড়াশুনো করেছিলেন কিংবা পড়াশুনোকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। মাইকেল বিদ্যার অনুধাবন করলেও রুচি অর্জন করেন নি; বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভূত শক্তির প্রভূত অপব্যয়ের হেতু চারিত্রগুণের অনটন।"

এই সকল অর্বাচীন অশ্রদ্ধেয় উক্তি প্রতিবাদের অযোগ্য, বুদ্ধদেবকে যাঁহারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, তাঁহাদের কাছে মাত্র এই সকল আপ্তবাক্য মর্যাদা-লাভ করিতে পারে। আসল সত্য ইহাই যে, বসু মহাশয় তাঁহার জন্ম ও শিক্ষার দোষে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি একেবারেই ধরিতে পারেন নাই, তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে।

—

বাংলা দেশকে দুই ভাগে ভাগ করার বিরুদ্ধে আমরা গত দুই সংখ্যায় কিছু সেন্টিমেন্টাল মন্তব্য করিয়াছিলাম, কিন্তু লীগ-শাসনের রোলার আমাদের বুকের উপর যে ভাবে চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে স্বতই মনে মনে বিভাগের স্বপক্ষে যুক্তি গজাইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে আগামী সংখ্যায় আমরা বিস্তৃততর আলোচনা করিব। শুধু নাম লইয়া গোলযোগে পড়িয়াছি, যদি কেহ সমাধান করিতে পারেন উপকৃত হইব। বাংলা দেশকে কার্জন সাহেব যখন বিভক্ত করিয়াছিলেন, তখন আমরা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন করিয়াছিলাম তাহার বিরুদ্ধে। আজ বাংলা দেশকে ভাগ করিবার জন্য যে আন্দোলন হিন্দু-বাঙালীরা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার কি নাম হইবে?

—

আমরা পূর্বে "সংবাদ-সাহিত্যে" "দেবল-সংহিতা'র উল্লেখ করিয়াছিলাম। ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী অনুগ্রহপূর্বক 'দেবল-সংহিতা'র সম্পূর্ণ ও সটীক অনুবাদ পাঠাইয়াছেন, আগামী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসোরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাবী ভারতের ভিত্তি

ব্যাপক আয়োজন চলেছে নব ভারতের ভিত্তি স্থাপনের জন্যে। এই মহৎ কাজকে সফল ক'রে তুলতে হ'লে নানাভাবে আপনার সাহায্য প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে এখন ব্যয়ের মাত্রা কমালে এক দিক থেকে পরোক্ষভাবে দেশ এবং প্রত্যক্ষভাবে আপনি লাভবান হবেন। ব্যয়কুণ্ঠ হ'লে শুধু যে বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে, তা নয়—আপনার সঞ্চিত অর্থ—তার পরিমাণ কমই হোক বা বেশি হোক—দশের উপকারে লাগে। কথাটা নতুন নয় বটে, কিন্তু অর্থ বিনিয়োগের সব চেয়ে নিরাপদ নির্ভরযোগ্য অথচ লাভজনক পন্থাটা জানা দরকার। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনলে এই সমস্যার অতি সহজেই মীমাংসা হ'য়ে যায়। আপনি নিজে যেমন এই সার্টিফিকেট কিনতে পারেন, তেমনি সব রকম প্রতিষ্ঠানও এই সার্টিফিকেট কিনে লাভবান হ'তে পারে।

কারণ

- বারো বছরে প্রতি দশ টাকা বেড়ে হয় পনেরো টাকা।
- সুদের উপর ইনকাম ট্যাক্স নেই।
- ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট যেমন সহজেই কেনা যায় তেমনি আবার সহজেই ভাঙানো যায়।

এই সার্টিফিকেট বা সেভিংস স্ট্যাম্প কিনতে পারেন পোস্ট অফিসে, গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত এজেণ্টদের কাছে অথবা সেভিংস ব্যুরোতে। সবিশেষ জানতে হ'লে লিখুন: ন্যাশনাল সেভিংস ডাইরেক্টরেট, ১ চার্নক প্লেস, কলিকাতা ১।

ন্যা শ না ল সে ভিং স সা র্টি ফি কে ট